প্রথম প্রকাশ
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

গ্রন্থসত্ব
কাজী সব্যসাচী। কাজী অনিরুদ্ধ

সম্পাদনা
কাজী সব্যসাচী । কাজী অনিরুদ্ধ
বিশ্বনাথ দে

প্রকাশক
নির্মলকুমাব সাহা
১৮ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

'কল্লোল' সম্পাদক কবি-বন্ধু দীনেশরঞ্জন দাশ-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

প্রতিটি মানুষের অন্তরঙ্গ মনের ছবিটি ফুটে উঠে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনকে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে। কবি নজরুলের কবি-মনের ছবিটি তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তাঁর ঘরোয়া হৃদয়-চিত্র ফুটে উঠেছে এই 'পত্রাবলী'র পৃষ্ঠাগুলিতে। ব্যক্তিগত জীবনে কবির অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যোগী বরদাচরণ মজুমদার। তাই বরদাচরণকে লেখা কবির চিঠি ক'টি দিয়ে এই গ্রন্থ শুরু করা হয়েছে। তারপর ছাপা হয়েছে কবির অনুরাগী বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে লেখা চিঠিগুলি।

'ধূমকেতু' সম্পাদনকালে কবি যে সম্পাদকীয়গুলি লিখেছিলেন, সেগুলিও তাঁর চিঠিপত্রেরই নামান্তর। ওই রচনাগুলির মধ্যেও কবির অন্তরঙ্গ মানসিকতার ছবি ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে এই কারণেই রচনাগুলি চিঠিপত্রের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া হলো। আর এই একই কারণে ছাপা হলো কবির অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রচনা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'।

যোগী বরদাচরণকে লেখা চিঠি দিয়ে এই গ্রন্থের শুরু, আর শেষেও দেওয়া হলো বরদাচরণের 'পথহারার পথ' গ্রন্থের জন্য কবির লিখে দেওয়া ভূমিকাটি। এর মধ্যেও একটি তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

সম্পাদক

॥ ১ ॥

[নজরুল যখন মাথরুন স্কুলের ছাত্র তখন কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন সে স্কুলের হেড মাস্টার। নজরুল উত্তরকালে কবি-খ্যাতি লাভ করার পর হিজ মাস্টার্স ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে কুমুদরঞ্জনকে এই পত্রটি লেখেন।]

37/1 Sitanath Road
Calcutta
6-4-36

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

বহুদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিনি—কলকাতা এলে খবর দেবেন যেন। আমি বর্তমানে H.M.V. Company-র Exclusive Composer. তাঁদেরই নির্দেশমত আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এই পত্র লিখছি। আপনার "অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা" গানটির permission (রেকর্ড করবার জন্য) চান কোম্পানী। এর আগে আপনার দু'চারটি গান আছে রেকর্ডে। আপনি যদি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি দেন, আপনার গানের Royalty (5% Commission) পাবেন। আপনার অনুমতি পেলেই কোম্পানী আপনাকে Royalty দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে দেবে। আশা করি পত্রোত্তর পাব। নিবেদন ইতি—

প্রণত—
নজরুল ইসলাম

P. S. আপনার ঐ গানের সঙ্গে আরও কোন্ গান গেলে ভাল হয় তা যদি নির্দেশ করেন, বা লিখে পাঠান সেই গানটি, ভাল হয়। —নজরুল।

॥ ২ ॥

[কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত পত্র]

৫৩জি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা
২৮. ১০. ৩৭

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

প্রণাম শতকোটি অন্তে নিবেদন ঃ বহু পূর্বে আপনার এক আশীর্বাদী পত্র পেয়েছিলাম। আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা' শীর্ষক গানটির কথাগুলি ও তার সাথে অন্য একটি গান (যা ওর জোড়া হতে পারে) যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তাহলে বিশেষ বাধিত হব। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঐ গান দু'টি গাইতে চান। আপনার প্রেরিত গান দুটি পেলেই রেকর্ড করা হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনাকে প্রত্যেক রেকর্ডে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে রয়্যালটি দিতে চান—এক সঙ্গে টাকা নেওয়ার চেয়ে এতে বেশী লাভ হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনার গান পেলে ঐ সর্ত অনুসারে লিখিত এগ্রিমেন্ট দেবে। যত শীঘ্র পারেন গান দু'টি পাঠিয়ে দেবেন। ৺বিজয়ার প্রণাম নেবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

নিবেদনমিতি। প্রণত—
নজরুল।

॥ ৩ ॥

[যোগী॰বরদাচরণ মজুমদারকে লিখিত পত্র]

৫৩জি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা
২২. ৮. ৩৮
(সকাল ৯টা)

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,

পরম পূজ্যপাদ দাদা। আপনার শ্রীকরকমলপরশপূত আশীর্বাদী লিপি পাইয়া আমি ও আপনার বৌমা অত্যন্ত আনন্দিত ও

কৃতার্থ হইয়াছি। পরশু সন্ধ্যায় আপনার পত্র পাইয়া একটু পরেই প্রথমে বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লিখিত মন্ত্র দিয়া ঔষধ খাওয়াই। আপনার পত্র পাওয়ার একটু পরেই নরেন ডাক্তার আসে, তাহাকে আপনার পত্র দেখাই। বিকালে আমাকে তাহার ডিসপেনসারিতে যাইতে বলায় সেখানে গিয়া তাহার সাথে দেখা করি। নরেন তখন বলে যে, সে রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না—তবে ইহা 'পক্ষাঘাত'-এর দিকে যাইতেছে।...

কল্য হরিদাস গাঙ্গুলি আসে, সে একটা শিকড় লইয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুলাইয়া হাতে সুতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে বলে। সে আপনার ভক্ত বলিয়া আমি আপত্তি করি নাই ও তদনুসারে বাঁধিয়া দিই। তাহার কিছুক্ষণ পর হইতেই তাহার ব্যথা বাড়িতে থাকে দেখিয়া আমি তাহা আবার খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। জানিনা আপনার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছি কিনা। আপনি শিব, আপনার ঔষধের পর আর কিছু করা উচিত ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানুষের এমনি মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকে।...

আপনার নির্দেশমত কার্য করিতে পারে নাই বলিয়া আপনার বৌমা আপনার শ্রীচরণারবিন্দে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। দুই দিন হইতে এখন ঐ ভাবে প্রণাম করিতেছে। তবে উঠিতে পারে না বলিয়া ঠিক ঐ ভাবে পারিতেছে না। এ সম্বন্ধে আপনার আদেশ জানাইবেন।

আমার এবং আপনার বৌমার ইচ্ছা আর কাহারও ঔষধ না খাওয়ার। যদি তাহার জীবনের কোন প্রয়োজন থাকে, আপনারই আশীর্বাদে সে বাঁচিয়া উঠিবে। স্বয়ং শিব যদি বাঁচাইতে না পারেন কেহ পারিবে না।

আপনার শ্রীচরণারবিন্দে দর্শনের আশায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। কখন পর্যন্ত আসিতে পারিবেন জানাইবেন। আমাকে গিয়া লইয়া আসিবার জন্য আপনার বৌমা বলিতেছে।

আপনি ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আপনি জন্মে জন্মে যাহা করিতেছেন আমার জন্য, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই। আপনি ও বৌদি আমার অনন্ত কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আবার হরগৌরী দেখার সৌভাগ্য কবে হইবে আপনিই জানেন। এই বন্ধন-জর্জরিত দাসকে মুক্তি দিন। দাদা, আর পারি না, আর ভাল লাগে না।···

নলিনীদার ছোট কন্যাটি মারা গিয়াছে, বোধ হয় শুনিয়াছেন। আপনি যখন প্রার্থনা করিতেছেন তখন আমার আর কোন ভয় নাই। শীঘ্র পত্রোত্তরদানে কৃতার্থ করিবেন। ইতি—

চির-প্রণত সেবক—

নজরুল।

॥ ৪ ॥

৫৩জি, হরি ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা

৪ ৯. ৩৮

(দুপুর সাড়ে বারোটা)

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,

পরম পূজ্যপাদ দাদা, আজ এখন পর্যন্ত আপনার পত্র আসিল না।···আপনার শরীরের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আছি, এ জন্যও প্রত্যহ আপনার পত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা করি।···

গতকল্য বিকাল হইতে আপনার বৌমার অত্যন্ত অস্থিরতা ও আনচানানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে সর্বদা আমাকে বলিতেছে, গুরুদেবকে আনাও, ওঁকে আসতে বল, ওঁকে আমার হয়ে ডাক. আমার ডাকে তিনি আসছেন না। আমি কি বলিব, চুপ করিয়া থাকি। আপনার শরীরের এই অবস্থা না হইলে গিয়া আনিতে

পারিতাম। যদি পরম পূজনীয়া বৌদি ও ছেলেদের সহ আসিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।···আপনি যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া আপনাদের সকলকে লইয়া আসিতে পারি। আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী বলিতেছেন, তিনি নাকি গত রাত্রে কি খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন তাঁহার কন্যার যাহা হইবে তাহা জানিতে নাকি তাঁহার বাকী নাই, তাঁহার এখন একমাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহার কন্যাকে শুধু একবার দেখা দিয়া যান—তাহা না হইলে তাঁহার কন্যা শান্তি পাইতেছেন না। যে যাহা বলিতেছে আমি শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি মাত্র। আপনার যাহা শুভ বিবেচনা হয় করিবেন। আমি নিরাশ হই নাই, আমার শ্রীবরদাচরণ ভরসা।···

রুগিনী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় মালিশ প্রায়ই হইতেছে না। অতি কষ্টে মাথা ধোওয়াইয়া দিতে হয়। একটু নাড়াচাড়া করিলেই রুগিনী অত্যন্ত অস্থির হইয়া ওঠে, মুখ নীল হইয়া যায়।···অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় সে এখন খিটখিটে-স্বভাব শিশুর মত কাঁদুনে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কোনো কথার প্রতিবাদ করিলেই সে কাঁদিতে থাকে। তাহাকে দিনে একশোবার করিয়া বলিতে হইবে যে, গুরুদেব আজ আসিবেন।' অন্য কোন কথা বলিলেই কাঁদে।···

আজ আবার আমার ছোট ছেলেটির (নিনির) জ্বর আসিয়াছে। আপনার বৌমার জন্য প্রার্থনা করিলে যদি আপনার শরীরের ক্ষতি না হয় তাহা হইলে প্রার্থনা করিবেন। আপনি তাহার জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কলিযুগে কেহ কখনো তাঁহার ভক্তের জন্য করেন নাই।···

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত
নজরুল।

॥ ৫ ॥

৫৩জি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা
৪. ৯. ৩৮
(দুপুর দু'টা)

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,

দাদা! আজ একখানা চিঠি কিছু আগেই দিয়াছি। চিঠি ডাকে পাঠানোর পরেই আমার শাশুড়ি কয়েকটি কথা বলিলেন। তাহা আপনাকে জানানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনায় আবার এই চিঠি দিতেছি।

গত বৎসর আশ্বিন কি কার্তিক মাসে শশী নামক একটি ঝি বাড়ীর বাসনপত্র মাজিত, বোধ হয় মাসখানেক সে কাজ করিয়াছিল —সে এ পাড়াতেই কোথাও থাকিত—গত অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে অপঘাতে সে মারা যায়।

আমার শাশুড়ি ৮।৯ দিন আগে সেই ঝিকে স্বপ্ন দেখেন—সে যেন রুগিনীর সম্মুখে চুল খুলিয়া নাচিতেছে। আমার শাশুড়ি সেই নৃত্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, সে তারকনাথের উপবাসী। আমার শাশুড়ি ঠিক মনে করিতে পারিতেছেন না সে 'তারকনাথের' উপবাসী বলিয়াছিল, না, ঐরূপ অন্য কোনো নাম বলিয়াছিল। তাহার স্পিরিট haunt করিতেছে কিনা জানিবার জন্য আপনাকে এ কথা জানাইলাম।

গত রাত্রে আমার শাশুড়ি আবার দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন তাঁহার কন্যার হঠাৎ দম বন্ধ হইয়া শেষ হইয়া গেল। আজ দিনে লক্ষ্য করিলাম রুগিনী ঘুমাইলে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দম বন্ধ হইয়া থাকিতেছে এবং কেবল কণ্ঠার হাড়ের নিকট ধুকপুক করিতেছে কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়াই সে জাগিয়া উঠিয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছে।...

আমার শাশুড়ি বলিতেছেন, তিনি কেন যেন আপনার বৌমার মৃতা খুড়িমার (যিনি প্রায় ৬।৭ মাস ভুগিয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মারা গিয়াছেন) উপস্থিতি রুগিনীর কাছে অনুভব করিতেছেন।···

আমি কয়েকদিন আগে শয্যায় একটু ধ্যান করিতেছিলাম, সেই সময় দেখিলাম এক ভীষণাকার রক্তচক্ষু প্রেত বা রাক্ষসমূর্তি আমার দক্ষিণদিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অবশ্য তখন আমি 'নীচে নামার' চেষ্টা করিতেছিলাম।

এই সব দেখার মধ্যে কোনো গুহ্য কারণ থাকিতে পারে সন্দেহ হওয়ায় আপনাকে জানাইলাম। আপনি ভূতনাথ, সত্যসত্যই ভূতের উপদ্রব থাকিলে আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া এই সব কথা জানাইতে বাধ্য হইলাম। দয়া করিয়া দেখিবেন কোনো Spirit এ বাড়ীতে আছে কি না।···

আপনার বৌমা বলিতেছে সে চোখে কম দেখিতেছে গতকল্য হইতে, কিন্তু দিন কতক আগেও Eye-specialist চক্ষু পরীক্ষা করিয়া ভাল বলিয়া গিয়াছেন।

এই সব নানা উপসর্গ-বৃদ্ধির জন্য মনে হয়, আপনি যদি দয়া করিয়া কেবল এক দিনের জন্য এখানে আসিতে পারেন, তাহা হইলে অত্যন্ত শুভদায়ক হইবে রুগিনীর পক্ষে। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত সেবকাধম

নজরুল।

॥ ৬ ॥

[বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ, ১৩২৬, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন মৌলবী মোহাম্মদ

শহীদুল্লাহ, এম-এ., বি. এল., এবং কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বি. এ.। প্রকাশক ছিলেন জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ। যতদূর জানা যায়, নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'। এই কবিতাটি কিছুদিন পরে মাসিক 'সহচর' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা 'কবিতা-সমাধি'—১৩২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। 'মুক্তি' প্রকাশের পর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র প্রকাশক করাচি থেকে কবি এই পত্রখানি লেখেন।]

From :
QUAZI NAZRUL ISLAM
Battalion Quartermaster Havilder
49th Bengalis.
Dated, Cantonment, Karachi
The 19th August, 1919.

আদাব হাজার হাজার জানবেন!

বা'দ আরজ, আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশী। আমার সবচেয়ে বেশী ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি 'কোরক' ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নই, আর যদিই সে-রকম হয়ে থাকি কারুর চক্ষে, তবে সে বে-মালুম ধুতরো ফুল। যা হোক, আমি তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশী কৃতজ্ঞ, তা' প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা' হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেব, এ একেবারে নির্ঘাত সত্যি কথা। কারণ, এবারে পাঠালুম একটি লম্বা-চওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায়-দীর্ঘ' গল্প আপনাদের পরবর্তী সংখ্যা কাগজে ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্তিক মাস এখনও অনেক দূরে। আগে থেকেই পাঠালুম, কেননা, এখন হতে এটা ভাল করে পড়ে রাখবেন এবং চাইকি আগে

হ'তে ছাপিয়েও রাখতে পারেন। তা' ছাড়া আর একটি কথা—শেষে হয়ত ভাল ভাল লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল 'রদ্দি' করে দেবে তখন হয়ত এত বেশী লেখা না পড়তেও পারেন। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যি-রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামাকা টুঁটি চেপে রেখেছিলাম। এখন বাকি কথা ক'টি মেহেরবাণী করে শুনুন।

যদি কোন লেখা পছন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ, সৈনিকের বড্‌ডো কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজার গুণ পরিশ্রম ক'রে একটু আধটু লিখি। আর কারুর কাছে ও একেবারে worthless হ'লেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক! আর ওটা বোধহয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হ'ল কি না, জানবার জন্যে আমার নাম-ঠিকানা লেখা একখানা Stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশী লেখা ছাপাবার মত জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তা' হ'লে যে কোন একটা লেখা 'সওগাতে'র সম্পাদককে Handover করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু'একটা ক'রে। যা ভাল বুঝেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেব, কারণ এখনও অনেক সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের money-value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোন কিছুরই কপি বা duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি'

নাম দিয়েছেন, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন ক'রে নেবেন। বড্‌ডো ছাপার ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায় না কি? আমি ভাল, আপনাদের কুশল সংবাদ দেবেন। নিবেদন ইতি—

খাদেম,
নজরুল ইসলাম।

॥ ৭ ॥

[পত্রখানি কুমিল্লার কান্দিরপাড থেকে জনাব আফজালুল হকের নিকট লিখিত। চিঠিতে আফজাল সাহেবকে কবি 'ডাবজল' বলে সম্বোধন করেছেন। এতে উভয়ের মধ্যকার প্রীতির সম্পর্কটুকু সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। চিঠিতে যে আরবী ছন্দের উল্লেখ আছে— আরবী ছন্দানুসারে লিখিত উক্ত কবিতাগুচ্ছ ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্যা "প্রবাসী"-তে প্রকাশিত হয়। "মায়ের স্নেহ" বলতে কবি, শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবীর অপার স্নেহের কথা স্মরণ করেছেন। বাংলা মাসের উল্লেখ থাক্‌লেও সনের উল্লেখ নেই। পোস্ট অফিসের শীলমোহর থেকে বোঝা যায় চিঠিখানি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চে লিখিত।]

Kandirpar
Comilla
15th Chaitra

ভাই ডাবজল!

'মোসলেম ভারত' কি ডিগবাজী খেল নাকি? খবর কি? 'ব্যথার দান' কেমন কাটছে? কত কাটল? অন্যান্য কাগজে সমালোচনা বা বিজ্ঞাপন বেরোলো না কেন? 'সার্ভেণ্ট' আর 'মোহম্মদী'র সমালোচনা এবং 'বিজলী' ও 'বাংলার কথা'য় বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র। 'আরবী'-ছন্দ দেখেছেন? কে কি বললে? আপনার মুমূর্ষু অবস্থা

দেখেই ওটা 'প্রবাসী'তে দিয়েছি। তার জন্য দুঃখিত হয়েছেন নাকি? আর সব খবর কি? মোসলেম ভারতের অবস্থা জানবার জন্য বড্ডো উদ্বিগ্ন। এতদিন চট্টগ্রাম বা অন্য কোথাও যেতে পারিনি তার কারণ এ বাড়িতে অন্ততঃ দু'জন করে অনবরত শয্যাগত রোগশয্যায়। এখন আবার বসন্ত হয়েছে মেয়েদের। এসব ছেড়ে যেতে পারিনি। তা' ছাড়া মায়ের স্নেহ আর নিজের আলস্য-ঔদাস্য তো আছেই। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে আসবেন নাকি? আমি যাব নিশ্চয়ই দেখতে। দুই কাজই হবে। নিজের শরীরও ভাল নয়। মনের অশান্তির আগুন দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ছে। অবশ্য আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন! হ্যাঁ, আমায় আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাবেন। Kindly, বড্ডো বিপদে পড়েছি। কারুর কাছে আমি যাই-ই হই আপনার কাছে আমি হয়তো ভালতে মন্দতে মিশে তেমনি আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে, আপনারই স্মরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হব না, তা' আপনি যত কেন দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন। টাকা চাই-ই চাই ভাই। নইলে যেতে পারব না। অনেক কষ্ট দিলুম— আরও দেব। 'ব্যথার দান' মোট নয়খানা পেয়েছি মাত্র। আরও খান-পনেরো আমার দরকার। যাক্ টাকা পাঠাবেনই যা করে হোক্।

আমার লেখাটা তা' হ'লে 'উপাসনা'য় দিয়ে দেবেন যদি মোঃ ভাঃ না বেরোয়।

চির স্নেহানুবদ্ধ,

নজরুল

॥ ৮ ॥

[শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র]

Dr. Bose's Sanatorium
Quarter No. 49
Deoghar
শুক্রবার : বিকেল
[কোনো তারিখ লেখা ছিল না—
ডাকঘরের স্ট্যাম্পের তারিখ 19 Dec. 20]

ভো ভো 'লিভুঁর' মুশঁয়ের !

গতকাল শুভ দিবা দ্বিপ্রহরে অহম্ দানবের এই দেওঘরেই আসা হয়েছে। অপাততঃ আসন পেতেছি ঐ ওপরের ঠিকানাতে। শিমুলতলা যাওয়া হয়নি। পথের মাঝে মত বদলে গেল। পরে সমস্ত কথা জানাব। জায়গাটা মন্দ নয়। তবে এক মাসের বেশী থাকতে পারব না এখানে, কেননা এখনো (?) খুব বেশী আনন্দ পাচ্ছি না।···নারায়ণের টাকাটা দিয়েছিস অবিনাশদা'কে ?

যদি হাতে টাকা থাকে, তবে 'বিজলি'র দু'টাকা তাদের অফিসে দিয়ে আমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলিস।···তোর বৌ'এর খবর কি ? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফৎ আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাধিয়ে দেব।···কান্তিবাবুকে আমার প্রীতি ভালবাসা আর প্রণাম জানাস। তোর গল্প লিখবো ; একটু গুছিয়ে নি আগে। বড্ডো শীত রে এ জায়গায়।

টাকা ফুরিয়ে গেছে, আবজল কিংবা খাঁ যেন শীগ্গীর টাকা পাঠায়, খোঁজ নিবি আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা' ব্যর্থ হবে না—আমি তা' সুদে-আসলে পুরে দেবো। ইতি—

তোর পিরীত-দধি-লুব্ধ মার্জার
নজরূ।

॥ ৯ ॥

[এই পত্রখানি জনাব মাহ্‌ফুজুর রহমান খানকে লিখিত। পত্রে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লেখা আছে: "শ্রীমান মাহ্‌ফুজুর, P. O. কুড়িগ্রাম, Dt Rangpur।" পত্রে উল্লেখিত 'প্রাণতোষ' হচ্ছেন হুগলী জেলার প্রতাপপুরের শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।]

স্নেহভাজনেষু—

মহফুজ! অনেক দিন তোমার খবর পাইনি। আমিও বাড়ি থাকি না—এখান ওখান ঘুরছি। কাল ফিরেছি বাঁকুড়া থেকে। মাঝে মাঝে প্রাণতোষের কাছে খবর পাই তোমার। সেও দেখা দিচ্ছে না কয়দিন থেকে। এখন কোথায় আছ, পাশ করেছ কিনা—এবং কোথায় কি পড়বে পাশ করলে—তা' জানিয়ো অবশ্য। বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাক্‌লে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবে। বড্‌ডো দরকার পড়েছে টাকার। আদায় না হয়ে থাকলে আদায় করবে পত্রপাঠ। বই বিক্রি না হলে ফেরৎ পাঠাবে—বই-এর বড্‌ডো দরকার। সকল ছেলেদের স্নেহাশীষ দিও। ইতি—

শুভার্থী—

P. S. পত্রোত্তর শীগ্‌গীর। নজরুল।

॥ ১০ ॥

[মাহফুজুর রহমানকে লিখিত পত্র]

হুগলী

২০শে জুলাই, ১৯২১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম। তুমি পাশ করেছ জেনে খুশী হলুম। কলেজেই পড় এখন। তুমি বোধহয় রংপুরের ইদরিশ ও ইলিয়াশকে

চেন। যদি না চেন, তোমাদের প্রফেসর সাতকড়ি মিত্র (আমার বড়দা)-কে জিজ্ঞেস করো—তিনি ব'লে দেবেন। ওদের সঙ্গে পরিচয় করো। তোমার আনন্দ হবে। ওরা বড্ডো ভালো ছেলে! ইদরিশের সঙ্গে দেখা হলে বলো—কতকগুলি বই ছিল ওদের কাছে (ওর এবং আজিজ বলে একটি ছেলের কাছে)—তার কী হলো? আজিজের সঙ্গেও আলাপ করো। রংপুরে সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে বড়দা (সাতকড়ি মিত্র)। এতদিন নিশ্চয় আলাপ হয়েছে তোমার। তাঁকে এবং বৌদিকে (ওখানে থাকলে) আমার প্রণাম দিও। ইদরিশ, ইলিয়াশ, আজিজ প্রভৃতি সব ছেলেদের এবং তোমাকে আমার স্নেহাশীষ। আমি বড় ব্যস্ত। বীরভূম যাচ্ছি ৪।৫ দিনের জন্য। ইতি—

শুভার্থী—

নজরুল।

॥ ১১ ॥

[বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক বলাই দেবশর্মাকে লিখিত পত্র]

হুগলী

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩২

শ্রীচরণেষু,

বলাইদা! আবার তুমি 'শক্তি'র হাল্ ধরে ভয়ের সাগরে পাড়ি দিলে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। 'ধুমকেতু'তে চড়ে আমার আর একবার বাংলার পিলে চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গোবর-মন্ত (সরকার) সাহেব পেছনে ভীষণ লেগেছে। কোন ক্রমেই একে উঠতে দেবে না। তাই 'বারো বাড়ী তেরো খামার, যে বাড়ী যাই সেই বাড়ীই আমার' নীতির অনুসরণ ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাংলার আবহাওয়া বড্ডো বেশী ভেপসে উঠেছে এবং তাতে অনেক

না-দেখা জীবনের উদ্ভব হয়েছে। এখন একজন শক্ত বেটাছেলের দরকার—যে কোদাল হাতে এগুলোকে সাফ করবে। লাভ-লোভকে এড়িয়ে চলার অসমসাহসিকতা নিয়ে তবে এতে নামতে হবে। যাক্, তুমি যখন নেমেছ, তখন কিছু একটা হবে বলে জোর আশা করছি। দেখ দাদা, তুমিও শেষে ভেস্তে যেয়ো না। এ ধূমকেতু-ল্যাজাও পেছনে রইল; নুড়ো জ্বালাবার আগুনের জন্য যখনি দরকার হবে চেয়ে পাঠিও। আর একটি কথা দাদা, মহাত্মা হবার লোভ করো না।···ইতি—

তোমার স্নেহধন্য—

নজরুল।

॥ ১২ ॥

[মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখিত এই পত্রে উল্লেখিত 'নলিনীদা', 'নৃপেন', 'শৈলজা', 'প্রেমেন', ও 'অচিন্ত্য' হচ্ছেন যথাক্রমে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।]

হুগলী

২৫ নভেম্বর, '২৫

প্রিয় মুরলীদা!

আজ তোমার চিঠি পেয়ে জ্বর-জ্বর মনটা বেশ একটু ঝরঝরে হয়ে উঠল। দুটো কথাতেই তোমার যে প্রীতি উপচে পড়েছে, তা' আমার হৃদয়-দেশ পর্যন্ত গড়িয়ে এসেচে। দিন ছয়েক থেকে ১০৩-৪-৫ ডিগ্রি ক'রে জ্বরে ভুগে আজ একটু অ-জ্বর হয়ে বসেছি। পঞ্চাশ গ্রেণ কুইনাইন মস্তিষ্কে উনপঞ্চাশ বায়ুর ভিড় জমিয়েছে। আমার একটা মাথাই এখন হয়ে উঠেছে দশমুণ্ড রাবণের মত ভারী, হাত দুটো নিসপিস্ করছে—সেই সঙ্গে যদি বিশটা হাতও হয়ে উঠত! তা' হলে আগে দেবতাগুষ্ঠির নিকুচি ক'রে আমাদের

ভাঙা ঘরে সত্যিকারের চাঁদের আলো আসে কি না দেখিয়ে দিতাম। মুশ্‌কিল হয়েছে মুরলীদা, আমরা কুম্ভকর্ণ হতে পারি, বিভীষণ হতে পারি—হতে পারিনে শুধু রাবণ। দেবতা হবার লোভ আমার কোন দিনই নেই—আমি হতে চাই তাজা রক্ত-মাংসের শক্ত হাড়্‌ডিওয়ালা দানব—অসুর! দেখেছ কুইনাইনের গুণ!…

যাক্‌, এখন ভাবছি শৈলজার মাটির ঘর তুলি কি ক'রে? মাথা তো একেবারে ভুর্‌-র্‌-র্‌-ভোঁ!…'লাঙলে'র ফাল আমার হাতে—'লাঙলে'র শুধু বা কাঠেরটাই বেরোয় প্রথমবার। শুধু একটা "কৃষাণের গান" দিয়েছি। নলিনীদাও নাকি চিদানন্দকে স্মরণ করেছেন—জ্বরে চিৎ। আফিসটা বোধহয় চিৎপুরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আফিসের দোরে একটা আস্ত লাঙল টাঙিয়ে দিতে বলেছি। ঐ হবে সাইন বোর্ড। বেশ হবে, না? যাক্‌, শৈলজাকে বলো একটা কিছু করবই।

তোমাদের একদিন আসতে হবে কিন্তু এখানে। Sincerely-র বাংলা যা হয়—তাই করে বলছি।…'দোলন চাঁপা' পেয়েছ নৃপেনের কাছ থেকে? তোমাদের সবাইকে দিয়েছি তার হাতে।…

হ্যাঁ, তোমাকে লিখতে হবে কিন্তু 'লাঙলে'। প্রথম বারেই দিতে হবে। সকলে মিলে কাঁধ দেওয়া যাক্‌।…শৈলজা, প্রেমেন, অচিন্ত্যকে তাড়া দিও লেখার জন্য।……আর জায়গা নেই……

—নজরুল।

॥ ১৩ ॥

[আন্‌ওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র]

হুগলী

২৩শে অগ্রহায়ণ (১৩৩২)

আমার প্রীতি ও সালাম নিন!

আপনার চিঠি…পেয়েছি। সময়-মত উত্তর দিতে পারিনি। তার কারণ, আমার অনবসরের আর অন্ত নেই। তজ্জন্য আমি

বড় লজ্জিত আছি ভাই—ক্ষমা করবেন। আপনি এত ভাল বাংলা লিখতে পারেন—আপনার আইডিয়া, ভাব, ভাষা এত স্বচ্ছ ও সুন্দর যে, আপনার সাথে কাগজে অনেক আগেই পরিচয় হওয়া উচিত ছিল। অথচ আপনি আপনাকে গোপন রেখেছেন—আর যত বাজে পুঁথিপড়া লেখকরাই আজ মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ লেখক!······ আপনার চিঠি পড়ে এত আনন্দ লাভ করেছি যে, অনেককে পড়ে শুনিয়েছি। মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া, এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুও বানিয়ে বলছিনে। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে—আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান—কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি!

আমি আপাততঃ শুধু ওইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি—আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ—আরব দেশ! ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথায় কবি জন্মাল না। এটা সত্য।······

—নজরুল ইসলাম।

॥ ১৪ ॥

[১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহ শহরে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক-শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে কবি কৃষ্ণনগর থেকে পত্রখানি লেখেন ; হেমন্ত কুমার সরকার তা সম্মেলনে পাঠ করেন।]

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ !

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ! আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নবজাগরিত প্রাণের স্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়া লইব—ধন্য হইব। কিন্তু দৈব প্রতিকূল, আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজও রীতিমত দুর্বল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার মত শক্তি আমার একেবারেই নাই। আশা করি, আমার এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন।

এই ময়মনসিংহ আমার কাছে নূতন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহারই বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আমার মনে সেই সব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই শৈশব-চেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার-হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহ-প্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব। কিন্তু তাহা হইল না,—দুরদৃষ্ট আমার। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব।

আপনারাই দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদেরই হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দিন নাই রাত নাই—সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই ত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয়

সন্তানের মত লালন-পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির লন, কিংবা তাকে শির দেন,--এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শস্যশ্যামল মাঠ,—আপনারা কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষার আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহধারার মতই মাঠ-ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়। আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদর-সোহাগে মাঠ-ঘাট ফুলে-ফলে-ফসলে শ্যাম-সবুজ হইয়া ওঠে, আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়া ওঠে। এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর--মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে,—এ মাঠ চাষার, এর ফুল-ফল কৃষক-বধূর।

আর আমার শ্রমিক ভাইরা, যাহারা আপাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের অস্থি-মজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রৌপ্য মুদ্রা তৈরী হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তা-মাণিক ফলাইতেছে, তাহারা আজ অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না, পরনে বস্ত্র নাই।

হায় রে স্বার্থ! হায় রে লোভী দানব-প্রকৃতির মানব! আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরানীতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে! দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই—এইবার তার প্রতিকারের ফেরেশতা,—দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটির তাঁহার গৃহ! তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা, তোমরাই তাঁহার পিতামাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নব-জাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, এই বুঝি নব-দিনমণির উদয় হইল! ইতি—

—নজরুল ইসলাম।

॥ ১৫ ॥

[হুগলী বাবুগঞ্জের শ্রীশচীন করকে লিখিত পত্র]

কৃষ্ণনগর

১০. ২. ২৬

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের শচীন! তোর কোন চিঠিও পাইনি, এলিও না। এলে খুব খুশী হতুম। আমার সব কথা প্রাণতোষের কাছে শুনবি।

মার্চে গীষ্পতি আস্‌বে—অবশ্য আসিস্‌। তুই নাকি খুব ভাল কবিতা লিখেছিস আরও কতকগুলো। আসবার সময় সবগুলো নিয়ে আসিস্‌। ভুলিস্‌নে যেন।

যে জোয়ালে গর্দান দিয়েছিস্‌, সেটার প্রতি যেন আসক্তি না জন্মে তোর—এই আমার বড় আশীষ। আমাদের সকলের স্নেহাশীষ নে। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

কাজীদা'।

॥ ১৬ ॥

[আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র]

কৃষ্ণনগর,

১লা মার্চ, ১৯২৬

ভাই!

…আমার স্বাস্থ্য ছিল অটুট,—জীবনে ডাক্তার দেখাইনি। এই আমার প্রথম অসুখ ভাই, বড্‌ডো ভোগাচ্ছে। প্রায় সাত মাস ধরে ভুগেছি জ্বরে। বড্‌ডো জীবনীশক্তি কমে গেছে। বাইরে থেকে খুব দুর্বল হইনি। এতদিন সুস্থ হয়ত হয়ে উঠতাম, কিন্তু অবসর বা

বিশ্রাম পাচ্ছিনে জীবনে কিছুতেই। এই শরীর নিয়েই আবার বেরুব ৬ই মার্চ দিনাজপুর। সেখানে ডিস্ট্রীক্ট কনফারেন্স, সেখানে থেকে মাদারিপুর Fishermen's Conference attend করতে যাব। ওখান থেকে খুব সম্ভব ঢাকা যাব। যদি যাই দেখা হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য। এত দুর্বল আমি এখনো যে, ধৈর্য ধরে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারিনে। আমাদের বাঙালী মুসলমানের সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে, করে যাও---তার জবাবদিহি করতে হয় না এ সমাজে,---কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ৎ তলব হয়। অথচ কোরানে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।

আমার লেখার পূর্ব তেজ ইত্যাদির কথা,—আপনি কি আমার বর্তমান লেখাগুলো পড়েছেন? আমি জানি না—লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা। হলেও আমি দুঃখিত নই। আমি যার হাতের বাঁশী, সে যদি আর আমায় না বাজায় তাতে আমার অভিযোগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি মনে করি সত্যি আমায় তেমন করেই বাজাচ্ছে, তার হাতের বাঁশী ক'রে। আমার লেখার উদ্দামতা হয়ত কমে আসছে—তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি আমার 'সাম্যবাদী' পড়েছেন? তা হলে বুঝবেন সব কথা। আপনার অভিযোগ আর যার হোক না কেন, সাহিত্যিকের নয়—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আমায় অধিকতর উৎসাহ দিচ্ছেন। তা ছাড়া, আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশীবাদকের বিদায়-পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি। তবে তার নবীনতর সুর শুনেছি। সেই সুরের আভাস আমার 'সাম্যবাদী'তে পাবেন। বাংলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোনদিন চিন্তা করিনি। এর জন্য লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি উপযুক্ত হই, একটা ছালা-টালা পাব হয়ত।...

—নজরুল ইসলাম।

॥ ১৭ ॥

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু। নজরুলের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'মাধবী-প্রলাপ' ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কালিকলমে প্রকাশিত হয়।]

কৃষ্ণনগর

১০. ৪. ১৯২৬

প্রিয় শৈলজা!

কনফারেন্সের হিড়িকে মরবার অবসর নেই। কনফারেন্সের আর মাত্র এক মাস বাকী। হেমন্তদা আর আমি সব করছি এ যজ্ঞের। কাজেই লেখাটা শেষ করতে পারিনি এতদিন। রেগো না লক্ষ্মীটি। আমি তোমাদের লেখা দিতে না পেরে বড় লজ্জিত আছি। "মাধবী-প্রলাপ" পাঠালুম।

বৈশাখেই দিও। দরকার হলে অদল-বদল ক'রে নিও কথা—অবশ্য ছন্দ রক্ষা করে। আমি এবার কলকাতায় গিয়েছিলুম—আল্লা…আর ভগবান……এর মারামারির দরুন তোমার কাছে যেতে পারিনি। আমি ২।৩ দিন পরে শ্রীহট্ট যুবক সম্মিলনীতে যোগদান করতে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আজ ডাকের সময় যায়, বেশী লিখব না।…মুরলীদা ও প্রেমেনকে ভালবাসা দিও। তোমরা নিও।

—নজরুল।

॥ ১৮ ॥

[বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত পত্র। ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল'-পত্রিকায় 'চিঠি' শিরোনামে এইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার শেষে পাদটীকায় বলা হয়েছিল: "চিঠিখানি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কোন বালিকাকে কয়েক বৎসর আগে লিখেছিলেন।"]

কৃষ্ণনগর
১১. ৮. ২৬
সকাল

স্নেহের নাহার,

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হতে। চট্টগ্রাম হতে এসেই কলকাতা গেছলাম। এসেই পড়লাম তোমার দ্বিতীয় চিঠি—অবশ্য তোমার ভাবীকে লেখা। আমি যেদিন তোমার প্রথম চিঠি পাই, সেদিনই—তখনই কলকাতায় যেতে হয়। মনে করেছিলাম কলকাতা গিয়ে উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনই বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে, কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর ক'রে নিতে পারিনি। তা'ছাড়া ভাই, তুমি অত কথা জানতে চেয়েছ, শুনতে চেয়েছ যে, কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমত ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার—ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে। চিঠি দিতে দেরি হ'ল বলে তুমি রাগ ক'রো না ভাই লক্ষ্মীটি। এবার হতে ঠিক সময়ে চিঠি দেবো, দেখে নিও। কেমন? বাহারটাও না জানি কত রাগ করেছে, কী ভাবছে। আর তোমার তো কথাই নেই, ছেলেমানুষ তুমি, পড়তে না পেয়ে তুমি এখনো কাঁদ! বাহার যেন একটু চাপা, আর তুমি খুব অভিমানী, না? কী যে করেছ তোমরা দুটি ভাই-বোনে যে, এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোন্ নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদাসর্বদা একটা বেদনার

উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন! রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্তমাংসের, দেহের, কিন্তু পথের সম্বন্ধটা হৃদয়ের অন্তরতম-জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালবাসি, তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে সকল কালে এই বাঁধনহারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। যে-নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই! আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ ক'রে গানের পাখী যারা, তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক। কোকিল বাসা বাঁধে না, 'বৌ কথা কও'-এর বাসার উদ্দেশ আজও মিলল না, 'উহু উহু চোখ গেল' পাখীর নীড়ের সন্ধান কেউ পেল না! ওদের আসা যাওয়া একটা রহস্যের মত। ওরা যেন স্বর্গের পাখী, ওদের যেন পা নেই, ধূলার পৃথিবীতে যেন ওরা বসবে না, ওরা যেন ভেসে আসা গান! তাই ওরা অজনা ব্যথার আনন্দে পাগল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেশে বিদেশে, বসন্ত-আসা বনে, ফুল-ফোটা কাননে, গন্ধ-উদাস ভুবনে। ওরা যেন স্বর্গের প্রতিধ্বনি, টুকরো-আনন্দের উল্কাপিণ্ড! সমাজ এদের নিন্দা করেছে, নীতিবাগীশ বায়স তার কুৎসিত দেহ—ততোধিক কুৎসিত কণ্ঠ নিয়ে এর ঘোর প্রতিবাদ করেছে, এদের শিশুদের ঠুকরে 'নিকালো হিঁয়াসে' ব'লে তাড়িয়েছে, তবু আনন্দ দিয়েছে এই ঘর-না-মানা পতিতের দলই! নীড়-বাঁধা সামাজিক পাখীগুলো দিতে পারল না আনন্দ, আনতে পারল না স্বর্গের আভাস, সুরলোকের গান……।

এত কথা বললাম কেন, জান? তোমাদের যে পেয়েছি এই আনন্দটাই আমায় এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের

পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া। গানের পাখী গান গায় খাবার পেয়ে নয়; ফুল পেয়ে, আলো পেয়ে সে গান গেয়ে ওঠে। মুকুল-আসা কুসুম-ফোটা বসন্তই পাখীকে গান গাওয়ায়, ফল-পাকা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় নয়। তখনো পাখী হয়তো গায়, কিন্তু ফুল যে সে ফুটতে দেখেছিল, গন্ধ সে তার পেয়েছিল—গায় সে সেই আনন্দে; ফল পাকার লোলুপতায় নয়। ফুল ফুটলে পায় গান, কিন্তু ফল পাকলে পায় ক্ষিদে; আমি পরিচয় করার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের মাঝে, কিন্তু ফুল-ফোটা মন মেলে না ভাই, মেলে শুধু ফল পাকার ক্ষুধাতুর মন। তোমাদের মধ্যে সেই ফুল-ফোটানো বসন্ত, গান-জাগানো আলো দেখেছি বলেই আমার এত আনন্দ, এত প্রকাশের ব্যাকুলতা। তোমাদের সাথে পরিচয় আমার কোন প্রকার স্বার্থের নয়, কোন দাবীর নয়। ঢিল মেরে ফল পাড়ার অভ্যেস আমার ছেলে বেলায় ছিল, যখন ছিলাম ডাকাত এখন আর নেই। ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে, সেখানে আমার গান গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু সেটুকু আমার, আর কারুর নয়। যাক, কাজের কথাগুলো ব'লে নিই আগে।

আমায় এখনও ধরেনি, তার প্রমাণ এই চিঠি। তবে আমি ধরা দেওয়ার দিকে হয়তো এগোচ্ছি। ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া এক নয়, তা' হয়তো বোঝ। ধরা দিতে চাচ্ছি, নিজেই এগিয়ে চলেছি শত্রু শিবিরের দিকে, এর রহস্য হয়তো বলতে পারি। এখন বলব না। এত বিপুল যে সমুদ্র, তারও জোয়ার-ভাটা আসে অহোরাত্রি। এই জোয়ার-ভাটা সমুদ্রেই খেলে, আর তার কাছাকাছি নদীতে, বাঁধ-বাঁধা ডোবায়, পুকুরে জোয়ার-ভাটা খেলে না। মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও বিপুলতর। খেলবে না তাতে জোয়ার-ভাটা? যদি না খেলে, তবে তা' মানুষের মন নয়—ঐ শান-বাঁধানো ঘাট-ভরা পুকুর-

গুলোতে কাপড় কাচা চলে, ইচ্ছে হলে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরাও চলে, চলে না ওতে জাহাজ, দোলে না ওতে তরঙ্গ দোলা, খেলে না ওতে জোয়ার-ভাটা···আমি একবার অন্তরের পানে ফিরে চলতে চাই, যেখানে আমার গোপন সৃষ্টি-কুঞ্জ, যেখানে আমার অনন্ত দিনের বধূ আমার জন্য বসে বসে মালা গাঁথছে। যেমন ক'রে সিন্ধু চলে ভাটিয়ালী টানে, তেমনি ক'রে ফিরে যেতে চাই গান-শ্রান্ত ওড়া-ক্লান্ত আমি। আবার অকাজের কথা এসে পড়ল। পুষ্প-পাগল বনে কাজের কথা আসে না, গানের ব্যথাই আসে, আমায় দোষ দিও না।

'অগ্নিবীণা' বেঁধে দিতে দেরী করছে দফতরী, বাঁধা হলেই অন্যান্য বই ও 'অগ্নিবীণা' পাঠিয়ে দেবো এক সাথে। ডি এম. লাইব্রেরীকে ব'লে রেখেছি। আর দিন দশেকের মধ্যেই হয়তো বই পাবে। আমার পাহাড়ে ও ঝর্নাতলে তোলা ফটো একখানা ক'রে পাঠিয়ে দিও। গ্রুপের ফটো একখানা (যা'তে হেমন্তবাবু ও ছেলেরা আছে), আমি বাহার ও অন্য কে একটি ছেলেকে নিয়ে তোলা যে ফটো, তার একখানা এবং আমি ও বাহার দাঁড়িয়ে তোলা ফটোর একখানা পাঠিয়ে দিও আমায়। ফটোর সব দাম আমার বই বিক্রির টাকা হতে কেটে নিও।

এখন আবার কোন্‌দিকে উড়ব, ঠিক নেই কিছু। যদি না ধরে, কোথাও হয়তো যাব, গেলে জানাব। এখন তোমার চিঠিটার উত্তর দিই। তোমার চিঠির উত্তর তোমার ভাবীই দিয়েছে শুনলাম। আরও শুনলাম, সে নাকি আমার নামে কতগুলো কী সব লিখেছে তোমার কাছে। তোমার ভাবীর কথা বিশ্বাস করো না। মেয়েরা চিরকাল তাদের স্বামীদের নির্বোধ মনে ক'রে এসেছে। তাদের ভুল, তাদের দুর্বলতা ধরতে পারা এবং সকলকে জানানোই যেন মেয়েদের সাধনা। তুমি কিন্তু নাহার, রেগো না যেন। তুমি এখনও ওদের দলে ভিড়নি। মেয়েরা বড্‌ডো অল্প বয়সে বড্‌ডো বেশী প্রভুত্ব করতে ভালবাসে।

তাই দেখি, বিয়ে হবার এক বছর পর ষোল-সতের বছর বয়সেই মেয়েরা হয়ে ওঠেন গিন্নি। তারা যেন কাজে অকাজে কারণে অকারণে স্বামী বেচারীকে বক্‌তে পারলে বেঁচে যায়। তাই সদাসর্বদা বেচারা পুরুষের পেছনে তারা লেগে থাকে গোয়েন্দা পুলিসের মত। এই দেখ না ভাই, ছ'টাকখানেক কালি ঢেলে ফেলেছি চিঠি লিখতে লিখতে একটা বই-এর ওপর, এর জন্য তোমার ভাবীর কী তম্বিহ্‌, কী বকুনি! তোমার ভাবী ব'লে নয়, সব মেয়েই অমনি। স্ত্রীদের কাছে স্বামীরা হয়ে থাকেন একেবারে বেচারাম লাহিড়ী।

একটা কথা আগেই বলে রাখি, তোমার কাছে চিঠি লিখতে কোন সঙ্কোচের আড়াল রাখিনি। তুমি বালিকা, এবং বোন ব'লে তার দরকার মনে করিনি। যদি দরকার মনে কর, আমায় মনে করিয়ে দিও। আমি এমন মনে ক'রে চিঠি লিখিনি যে, কোন পুরুষ কোন মেয়েকে চিঠি লিখছে। কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কাউকে, এই মনে করেই চিঠিটা নিও। চিঠি লেখার কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে দেখিয়ে দিও।

আমার 'উচিত আদর' করতে পারনি লিখেছ, আর তার কারণ দিয়েছ, পুরুষ নেই কেউ বাড়ীতে এবং অসচ্ছলতা। কথাগুলোয় সৌজন্য প্রকাশ করেছ খুব বেশী, কিন্তু ওগুলো তোমাদের অন্তরের কথা নয়। কারণ, তোমরাই সবচেয়ে বেশী ক'রে জান যে, তোমরা যা আদর-যত্ন করেছ আমার, তার বেশী করতে কেউ পারে না। তোমরা তো আমার কোথাও ফাঁক রাখনি শূন্যতা নিয়ে অনুযোগ করবার। তোমার আমার মাঝে অভাবের অবকাশ তো দাওনি তোমাদের অভাবের কথা ভাববার ; এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি সহজেই সহজ হতে পারি সকলের কাছে, ওটা আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; কিন্তু তোমাদের কাছে যতটা সহজ হয়েছি—অতটা সহজ বুঝি আর কোথাও হইনি। সত্যি নাহার, আমায় তোমরা আদর-যত্ন করতে পারনি বলে যদি সত্যই কোন সঙ্কোচের কাঁটা থাকে তোমাদের

মনে তবে, তা' অসঙ্কোচে তুলে ফেলবে মন থেকে। অতটা হিসেব-নিকেশ করবার অবকাশ আমার মনে নেই, আমি থাকি আপনার মন নিয়ে আপনি বিভোর। মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে বলতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, খেই হারিয়ে ফেলি কথার। আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে। আর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা লিখেছ। অর্থ দিয়ে মাড়োয়ারীকে, জমিদার মহাজনকে বা ভিখারীকে হয়তো খুশী করা যায়, কবিকে খুশী করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতাটা পড়েছ? ওতে এই কথাই আছে।—কবি রাজ-দরবারে গিয়ে রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাজ-প্রদত্ত মণি-মাণিক্যের বদলে চাইলে রাজার গলার মালাখানি। কবি লক্ষ্মীর প্যাঁচার আরাধনা কোন কালে করেনি, সরস্বতীর শতদলেরই আরাধনা করেছে—তাঁর পদ্মগন্ধে বিভোর হয়ে শুধু গুন্‌গুন্ ক'রে গান করেছে আর করেছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে অভি-বন্দনা করলে কবি তাতে অখুশী হয়ে ওঠে। কবিকে খুশী করতে হলে দিতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত। সে সওগাত তোমরা দিয়েছ আমার অঞ্জলি পুরে'। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব আর দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা তাই দিয়ে। রূপার দাম আছে বলেই রূপা অত হীন; হাটে-বাজারে মুদীর কাছে, বেনের কাছে, ওজন হতে হতে ওর প্রাণান্ত ঘটল; রূপের দাম নেই বলেই রূপ এত দুর্মূল্য, রূপ এত সুন্দর, এত পূজার! রূপা কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে, রূপ কিনতে হয় হৃদয় দিয়ে। রূপের হাটের বেচা-কেনা অদ্ভুত। যে যত অমনি—যে যত বিনা দামে কিনে নিতে পারে, সে তত বড় রূপ-রসিক সেখানে। কবিকে সম্মান দিতে পারনি ব'লে মনে যদি ক'রেই থাক, তবে তা' মুছে ফেলো। কোকিল পাপিয়াকে বাড়ীতে ডেকে ঘটা ক'রে খাওয়াতে পারনি ব'লে তারা তো অনুযোগ করেনি কোনদিন। সে-

কথা ভাবেও নি কোনদিন তারা। তারা তাই বলে তোমার বাতায়নের পাশে গান গাওয়া বন্ধ করেনি। তা ছাড়া কবিকে হয়তো সম্মান করা যায় না—কাব্যকে সম্মান করা যায়। তুমি হয়তো বলবে, গাছের যত্ন না নিলে ফুল দেয় না। কিন্তু সে যত্নেরও তো ত্রুটি হচ্ছে না। অনাত্মীয়কে লোকে সম্বর্ধনা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ; বন্ধুকে গ্রহণ করে হাসি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।

উপদেশ আমি তোমায় দিইনি। যদি দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। উপদেশ দেওয়ার চাণক্য আমি নই। দিয়েছি তোমার অনাগত বিপুল সম্ভাবনাকে অঞ্জলি—তোমার মাঝের অপ্রকাশ সুন্দরকে প্রকাশ-আলোতে আমার আহ্বান জানিয়েছি শঙ্খধ্বনি ক'রে। উপদেশের ঢিল ছুঁড়ে তোমার মনের বনের পাখীকে উড়িয়ে দেবার নির্মমতা আমার নেই, এ তুমি ধ্রুব জেনো। আমি ফুল-ঝরা দিয়ে হাসাই, শাখার মার দিয়ে কাঁদাইনে।

তোমায় লিখতে বলেছি, আজও বলছি লিখতে। বললেই যে লেখা আসে, তা নয়। কারুর বলা যদি আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা তোমায় বলেছি লিখতে। সে-বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে, শিশিরে ছোঁওয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকল হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসত না। তোমার মনের সুন্দর যিনি, তিনি যদি খুশী হয়ে ওঠেন, তা হলে সেই খুশীই তোমায় লিখতে বসাবে। আমার বলা তোমার সেই মনের সুন্দরকে অঞ্জলি দেওয়া। বলেছি অঞ্জলি দিয়েছি। তিনি খুশী হয়ে উঠেছেন কিনা, তুমি জান। তুমি আজও অনেকখানি বালিকা। তারুণ্যের যে আনন্দ, যে ব্যথা সৃষ্টি জাগায়, সেই উচ্ছ্বাস, সেই আনন্দ, সেই ব্যথা তোমার জীবনের আসার এখনো অনেক দেরি। তাই সৃষ্টি তোমার আজও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল

না। তার জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য অর্জন ক'রো। তরুর শাখায় আঘাত করলে সে ফুল দেবে না, যখন দেবে সে আপনি দেবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী ক'রে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেওয়াল। বাইরের আঘাত এ দেওয়ালে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা। দ্বার ভাঙার পুরুষতার নারীদের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের দ্বার ভিতর হতে বন্ধ, বাহির হতে নয়। তোমারও যে কী হবে তা বলতে পারিনে। তার কারণ তোমায় চিনলেই তো চলবে না, তোমায় চালাবার দাবী নিয়ে জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের আজও চিনিনি। আমার কেন যেন মনে হ'ল, বাহার তোমার অভিভাবক নয়। ভুল যদি না ক'রে থাকি, তা' হলেই মঙ্গল। অভিবাবক যিনিই হ'ন তোমার, তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি ব'লেই মনে হ'ল। তোমায় যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্য, এও হয়তো সেই কারণেই। মিসেস্ আর. এস্ হোসেনের মত অভিভাবিকা পাওয়া অতি বড় ভাগ্যের কথা। তাঁকেও যখন তাঁরা স্বীকার ক'রে নিতে পারলেন না, তখন তোমার কী হবে পড়ার, তা আমি ভাবতে পারিনে। তোমার আর বাহারের ওপর আমার দাবী আছে—স্নেহ করার দাবী, ভালবাসার দাবী, কিন্তু তোমার অভিভাবকদের ওপর তো আমার দাবী নেই। তবুও ওপর-পড়া হয়ে অনেক বলেছি এবং তা' হয়তো তোমার আম্মা নানী সাহেবা শুনেওছেন। বিরক্তও হয়েছেন হয়তো।

আলোর মত শিশিরের মত আমি তোমার অন্তরের দলগুলি খুলিয়ে দিতে পারি হয়তো, দ্বারের অর্গল খুলি কি করে? তুমি আমার সামনে আসতে পারনি ব'লে আমার কোনরূপ কিছু মনে হয়নি। তার কারণ, আমি তোমাকে দেখেছি এবং দেখতে চাই লেখার মধ্য দিয়ে। সেই হ'ল সত্যকার দেখা। মানুষ দেখার কৌতূহল আমার নেই, স্রষ্টা দেখার সাধনা আমার। সুন্দরকে দেখার তপস্যা আমার। তোমার প্রকাশ দেখতে চাই আমি, তোমায় দেখতে চাইনে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে যে দেখেছে, সেই বড় দেখা দেখেছে। এই দেখা আর্টিস্টের দেখা, ধেয়ানীর দেখা, তপস্বীর দেখা। আমার সাধনা অরূপের সাধনা। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের যে রাজকুমারী বন্দিনী, সেই রূপ-কথার অরূপাকে মায়া-নিদ্রা হতে জাগাবার দুঃসাহসী রাজকুমার আমি। আমি সোনার কাঠির সন্ধান জানি—যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বন্দিনী উঠবে জেগে, রূপার কাঠির মায়া-নিদ্রা যাবে টুটে, আসবে তার আনন্দের মুক্তি। যে চোখের জল বুকের তলায় আটকে আছে, তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যথা-হানা আমি। মানস সরোবরে বন্ধ জলধারাকে শুভ শঙ্খধ্বনি ক'রে নিয়ে চলেছি কবি আমি ভগীরথের মত। আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে, দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দু'ধারের গ্রামবাসীদের জন্য, তা' তার এক আনা। বাকী পনের আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনের আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি-দিন হতে আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যত বলা আমার সেই বিপুলতরকে নিয়ে, আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে। তোমাকেও বলি, তোমার তপস্যা যেন তোমার সুন্দরকে নিয়েই থাকে মগ্ন। তোমার চলা, তোমার বলা যেন হয় তোমার সুন্দরের উদ্দেশে, তাহলে তোমায় প্রয়োজনের বাঁধ দিয়ে কেউ বাঁধতে পারবে না।'

তোমার অন্তরতমকে ধ্যান কর তোমার বলা দিয়ে। বাধা যেন তোমার ভিতর দিক থেকে জমা না হয়ে ওঠে। এক কাজ করতে পার, নাহার? তোমার সকল কথা আমায় খুলে বলতে পার? কী তোমার ব্রত, কী তোমার সাধনা—এই কথা। আমার কাছে সঙ্কোচ করো না। আমি তাহলে তোমার গতির উদ্দেশ পাব, আর সেই রকম ক'রে তোমায় গ'ড়ে উঠবার ইশারা দিতে পারব। আমি অনেক পথ চলেছি, পথের ইঙ্গিত হয়তো দিতে পারব। তাই বলে আমি পথ চালাব, এ ভয় করো না।

বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে, তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বদ্ধ ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ, তা' সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা' বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টির বেদনা মনের মাঝেই গুমরে মরে।

আমার কাছে দামী কথা শুনতে চেয়েছ। দামী কথার জুয়েলার আমি নই। আমি ফুলের বেসাতি করি। কবি বাণীর কমল-বনের বনমালী। সে মালা গাঁথে, সে মণি-মাণিক্য বিক্রি করে না। কবি কথাকে দামী করতে পারে না, সুন্দর করতে পারে। 'বৌ কথা কও' যে কথা কয়, কোকিল যে কথা কয় তার এক কানাকড়ি দাম নেই। ওরা দামী কথা বলতে জানে না। ওদের কথা শুধু গান। তাই বুদ্ধিমান লোক তোতা পাখী পোষে, ময়না পাখী পোষে, ওরা ওদের রোজ 'রাধা-কেষ্ট' বুলি শোনায়। আমরা যা বলি, তার মানেও নেই, দামও নেই। তোমায় বুদ্ধিমান লোকের দলের জানিনে বলে এত বকে যাচ্ছি। শুনতে যদি ভাল না লাগে জানিয়ো, সাবধান হব।

আমার জীবনের ছোট-খাট কথা জানতে চেয়েছ। বড় মুশকিল কথা, ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং, তা' আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার

রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার, ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেল। জীবনের ঘটনা দিয়ে কৌতুক অনুভব করতে পার। কিন্তু তা' দিয়ে আমাকে চিনতে পারবে না। সূর্যের কিরণ আসলে সাতটা রং—রামধনুতে যে রং প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সূর্য যখন ঘোরে, তখন তাকে দেখি আমরা শুভ্র জ্যোতির্ময়রূপে। সূর্যের চলাটা প্রতারণা করে আমাদের চোখকে—তার বুকের রং দেখতে দেয় না সে। কিন্তু ইন্দ্রধনু যখন দেখি, ওতেই দেখতে পাই ওর গোপন প্রাণের রং। ইন্দ্রধনু যেন সূর্যের লেখা-কাব্য। মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে বেশী প্রতারণা করে। রাধা ভালবেসেছিল কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণের বাঁশীকে। তোমরাও ঠিক ভালবাস আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি, ভাই! সূর্যের কিরণ আলো দেয়, কিন্তু সূর্য নিজে দগ্ধ হচ্ছে দিবানিশি। ওর কাছে যেতে যে চায়, সেও হয় দগ্ধীভূত। আলো সওয়া যায়, শিখা সওয়া যায় না। আমি জ্বলছি শিখার মত, আপনার আনন্দে আপনি জ্বলছি, কাছে এলে তা' দেয় দাহ, দূর হতে দেয় আলো। তোমাদের কাছে ছিলাম যে-আমি সেই-আমি কি এক? তোমরা কবিকে জানতে চাও, না নজরুল ইস্‌লামকে জানতে চাও, তা' আগে জানিয়ো; তা' হলে আমি এর পরের চিঠিতে একটু একটু ক'রে জানাব তার কথা। চাঁদ জোছনা দেয়, কথা কয় না। বহু চকোর-চকোরীর সাধ্যসাধনাতেও না। ফুল মধু দেয়, গন্ধ দেয়, কথা কয় না। বহু ভ্রমরার সাধ্যসাধনাতেও না। বাঁশী কাঁদে যখন গুণীর মুখে তার চুমোচুমি হয়; বাকী সময়টুকু সে এক কোণে নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। একই ঝাড়ের বাঁশ, ভাগ্যদোষে বা গুণে কেউ হয়ে উঠে লাঠি, কেউ হয় বাঁশী। বীণা কত কাঁদে, কথা কয় গুণীর কোলে শুয়ে, বাকী সময়টুকু তার খোলের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে সে নিস্পন্দিত হয়ে থাকে। গানের পাখী, তাকে গানের

কথাই জিজ্ঞাসা কর, নীড়ের কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। নিজেই বলতে পারবে না সে, কোথায় ছিল তার নীড়। জন্ম নিয়ে গান শিখে উড়ে যাবার পর নীড়টার মত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর তার কাছে নেই। নীড়ের পাখী তখন বনের পাখী হয়ে ওঠে। গুরুদেব বলেছেন, ফসল কেটে নেবার পর মাঠটার মত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই। তবু সেই অপ্রয়োজনের যদি প্রয়োজন অনুভব করে তোমাদের কৌতুক, তবে জানিয়ো।

চিঠি লিখছি আর গাচ্ছি একটা নতুন লেখা গানের দুটো চরণ—

"হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিণীরে চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির-নীরে এলে নাহিয়া।"

কবির আসা ঐ ঝরা শেফালির পথ বেয়ে আসা। কার বিষাদের শিশির জলে নেয়ে আসে, তা' সে জানে না। তার নিজের কাছেই সে একটা বিপুল রহস্য।

আমার লেখা কবিতাগুলো চেয়েছ। হাসি পাচ্ছে খুব কিন্তু। কী ছেলেমানুষ তোমরা দুটি ভাই বোন। যে-খন্তা দিয়ে মাটি খোঁড়ে মালি, সেটারও যে দরকার পড়ে ফুলবিলাসীর এ আমার জানা ছিল না। যে পাতার কোলে ফুল ফোটে, সে-পাতা কেউ চায় না, এই আমি জানতাম। মালা গাঁথা হবার পর ফুল-রাখা পদ্ম-পাতাটার কোন দরকার থাকে, এও একটা খুব মজার কথা, না? যাক্ চেয়েছ—দেবো। তবে এ পল্লব শুকিয়ে উঠবে দু'দিন পরে, থাকবে যা তা' ফুলের গন্ধ। তা' ছাড়া, অত কবিতাই বা লিখব কোত্থেকে যে খাতা ভর্তি ক'রে দেবো। বসন্ত তো সব সময় আসে না। শাখার রিক্ততাকে যে ধিক্কার দেয়, সে অসহিষ্ণু; ফুল ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে জানে যে, সে-ই ফুল পায়। যে অসহিষ্ণু চলে

যায়,' সে তো পায় না ফুল, তার ডালা চিরশূন্য রয়ে যায়। তোমাদের ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা দেশ, তোমাদের সিন্ধু পর্বত গিরিদরীবন আমায় গান গাইয়েছিল। তোমাদের গান গাইয়েছিল। তোমাদের গান শোনার আকাঙ্ক্ষা আমায় গান গাইয়েছিল। রূপের দেশ ছাড়িয়ে এসেছি এখন রূপেয়ার দেশে, এখানে কি গান জাগে? বীণাপাণির রূপের কমল এখানকার বাস্তবতার কঠোর ছোঁয়ায় রূপার কমল হয়ে উঠেছে। কমলবনের বীণাপাণি ঢুকেছেন এখানের মাড়োয়ারী মহলে। ছাড়া যেদিন পাবেন, আসবেন তিনি আমার হৃদ্-কমলে। সেদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আমার।

আমার কবিতার উৎস-মুখের সন্ধান চেয়েছ। তার সন্ধান যতটুকু জানি নিজে দেখিয়ে দেবো।

আর কিছু লিখবার অবসর নেই আজ। মানস-কমলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কেমন যেন নেশা করেছে, বোধ হয় বীণাপাণি তাঁর চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর শতদলে। এখন চললাম ভাই। চিঠি দিও শিগ্‌গীর। আমার আশিস্ নাও। ইতি—

তোমার

নূরুদা।

পুঃ—

তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে এসেছি, সে সব ভুলে যেও। তোমার আম্মা ও নানী সাহেবার পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব জানাবে আমার। শামসুদ্দিন ও অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশীষ জানাবে। তুমি কি বই পড়লে এর মধ্যে বা পড়ছ, কি কি লিখলে, সব জানাবে। তোমার লেখাগুলো আমায় আজই পাঠিয়ে দেবে। চিঠি দিতে দেরি ক'রো না। 'কালিকলম' পেয়েছ বোধ হয়। তোমায় পাঠানো হয়েছে। তোমার লেখা চায় তারা।

নূরুদা।

॥ ১৯ ॥

[খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখিত কার্ডখানিতে ৯.১০. ২৬তারিখ লেখা ; কিন্তু ডাক-বিভাগের সিল দুটিতে আছে "Krishnanagar Sept ; 26" ও "Calcutta G. P. O. 10 Sept ; 26"। যে 'খোকা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে কবির দ্বিতীয় পুত্র 'বুলবুল'।]

কৃষ্ণনগর

৯. ১০. ২৬

স্নেহভাজনেষু,

মঈন ! আজ সকালে আমাদের একটি খোকা এসেছে। তোর ভাবী ভাল আছে। খোকা বেশ মোটাতাজা হয়েছে। নাসিরুদ্দীন সাহেবকে খবরটা দিস্। চট্টগ্রাম থেকে কোন কবিতা পেয়েছিস কি আমার ? 'সর্বসহা' দিবি তো 'সওগাতে' ? নতুন লেখা শীগ্‌গীরই দেবো। আমি যশোর-খুলনা ঘুরে আজ ফিরছি।—এইবার গিয়ে শামসুদ্দীন সাহেবকে বইগুলো পাঠিয়ে দেবো। কাল কিংবা পরশু যাব কলকাতা। ৩৭ নম্বরে খবর নিস একবার। ভালোবাসা ও স্নেহাশীষ নে। ইতি—

কাজী ভাই।

॥ ২০ ॥

[শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

৯. ১০. ২৬

পরম স্নেহভাজনেষু—

স্নেহের ব্রজ ! আজ সকাল ছয়টায় আমার একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। তোমার বৌদি আপাতত: ভাল আছে। আমিও আজ

সকালে ফিরে এলাম যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর প্রভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ডো দরকার। যেমন ক'রে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার ক'রে পাঠাও। তুমি তো সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়। কেবল 'সঞ্চিতা'র প্রুফ পেলাম— 'সর্বহারা'র শেষ প্রুফ কই? 'সর্বহারা' কখন বেরুবে? যেদিন বেরুবে অন্তত ৫০ কপি আমায় পাঠিয়ে দেবে।

ভুলো না যেন। টাকা কর্জ ক'রেও পাঠাও। স্নেহাশীষ নাও। পত্র দিও। ইতি—

তোমার

[পত্রটি শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত। নজরুলের 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানটি এবং ঐ গানের কবিকৃত স্বরলিপি প্রথম বর্ষের আশ্বিন সংখ্যা 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় তাঁর 'অনামিকা' কবিতাও ছিল। প্রথম বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা 'কালিকলমে' 'লেখ্‌রাজ সামন্ত' ছদ্মনামে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'শুঁটকি ও ফুপী' গল্পটি লেখেন।]

কৃষ্ণনগর

৯. ১০. ২৬

প্রিয় মুরলীদা!

আজ সকাল ৬টায় একটি 'পুত্ররত্ন' প্রসব করেছেন শ্রীমতী গিন্নি। ছেলেটা খুব 'হেলদি' হয়েছে। শ্রীমতীও ভাল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। হয়ে যাবার পর এলাম খুলনা হতে। খুলনা, যশোহর, বাগেরহাট, দৌলতপুর, বনগ্রাম প্রভৃতি ঘুরে ফিরলাম আজ। শৈলজা কী করছে? প্রেমেন কোথায়?…চিঠি দিও। কবিতাটার ও স্বরলিপিটার প্রুফ পাঠিও, যদি সম্ভব হয়!…

শুঁটকি ও ফুপী অদ্ভুত—অপূর্ব গল্প হয়েছে। ইতি—

নজরুল।

॥ ২২ ॥

[শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

২০. ১২. ২৬

স্নেহের ব্রজ !

আজও আমি শয্যাগত। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ্ জানেন। তোমার প্রেরিত পনর টাকা পেয়েছি। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলুম। অবশ্য, তোমারও বিপদ-আপদের কথা শুনলুম। আরও যদি পাঠাতে পার আমার এই দুর্দিনে, বড় উপকৃত হব। তুমি ছোট ভাইয়ের মত, তোমাকে বেশী কি লিখব। তোমার অন্যান্য খবর দিও। 'সর্বহারা' কাটছে কেমন ?

তোমার

কাজীদা।

॥ ২৩ ॥

[শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

২৬. ১২. ২৬

মুরলীদা !

তোমার চিঠি যখন পাই, তখন আমি বিছানা-সই হয়ে পড়ে আছি। তাই উত্তর দিতে পারি নি। প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বরে ভুগে আজ দিন চারেক হল ভাল আছি। তুমি একা পড়েছ 'কালিকলম' নিয়ে। শৈলজা ভুগছে আজও—শুনলুম।

আমি এবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং চারিদিক দিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়েছি যে, এবার বুঝি সামলানো দায় হবে এই ভেবেছিলুম প্রথমে। অবশ্য সাম্‌লে উঠেছি তা-ও নয়। নিত্য-অভাবের চিত্তক্ষোভ আমায় আরো দুর্বল ক'রে তুলছে। এখনও বাড়ী ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই।—তোমার এ-সময় সময় নেই, তবু একটা কাজ দিচ্ছি। আমি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু গজলের সুরে। তার কয়েকটা 'সওগাতে' দিয়েছি। দুটো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—'বঙ্গবাণী'তে দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে দেবার জন্য। অন্য সব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় আমার প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, এ-কথা ওদের বলো। গান দুটি পেয়েই যদি ওরা টাকাটা দেয় তা হলে আমার খুব উপকারে লাগে।—আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলীদা,—না? অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে!

তোমাদের কালিকলমের জন্য মাঘ পর্যন্ত তো রয়েছে, তারপর আবার লেখা দেবো, অন্ততঃ দুটো গজল পাঠিয়ে দেবো। এখন যদি চাও তো লিখো।

হ্যাঁ 'বঙ্গবাণী'তে জিজ্ঞাসা ক'রো, ওঁরা যদি স্বরলিপি চান তা' হলে গজল দুটোর স্বরলিপি করে পাঠাতে পারি ২।১ দিনের মধ্যেই। 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দাও না মুরলীদা—ওঁরা প্রতি মাসে কিছু ক'রে দেবেন, আমিও সেই অনুসারে লেখা দেবো প্রতি মাসে। কি হয়, লিখে জানিও।...

আমাদের বাড়ীর আর সকলে ভাল। দেখলে, কেবল নিজের কথাই এক কাহন করলুম। প্রেমেনের ঠিকানাটি দিও।...

নজরুল।

॥ ২৪ ॥

[শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

২. ১. ২৭

মুরলীদা!

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম।…এখন সন্ধ্যা। আর সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি—চিঠি তো নয়, বুক-চাপা কান্না। দুই বাল্য-বন্ধু যৌবনের মাঝ-দরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরাডুবি দেখছি। কারুর কিছু করবার শক্তি নেই!…যত ভাঙা তরীর ভিড় এক জায়গায়!…

আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমি বেশী চিন্তিত, কাজেই আমার কোনো চিন্তা নেই, যা করবার তুমি ক'রো। বসে শুয়ে লিখবার কসরৎ করি, আর ভাবি, কুল-কিনারা নেই সে ভাবার।…

আমার জ্বর আসে কিস্তিবন্দী হারে। দ্বিতীয় কিস্তির সময় কখন আসে—কে জানে। আজ 'কালিকলম' পেলুম। এত ভাল কাগজ বলেই এর অবস্থা এত মন্দ।…

নজরুল।

॥ ২৫ ॥

[শ্রীশচীন করকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

৩. ১. ২৭

স্নেহভাজনেষু—

স্নেহের হাবুল! তুই এবার এলিনে, আস্‌লে বড় খুশী হতুম। তোকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, দেখিনি অনেক দিন তোদের; কিন্তু তোর চেয়েও তোর মাঝে যে কবি-শিশুটি দিনের দিন বড় হয়ে উঠছে

তাকে দেখবার বেশী ইচ্ছা ছিল। একদিন তাকে দেখবই, তখন হয়ত সে রীতিমত ঘোড়দৌড় করছে দেখব। কিন্তু মানুষদের ঘোড়দৌড় দেখার চেয়ে শিশুর হাঁটি-হাঁটি পা-পা দেখতে অধিক ভাল লাগে। প্রাণতোষকে দেখলাম, তার মনের কবি বোধহয় তোর অগ্রজ। তার কবি-শিশু এখন বেশ চল্‌তে শিখেছে, আগে পা পিছ্‌লাত, এখন পা শক্ত হয়েছে। চলার মিল ছিল না আগে, এখন দুটো চরণই বেশ মিলেমিশে চলেছে।—ওর দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল বলে। অর্থাৎ ও কবি বলে পরিচিত হল বলে। কবি হওয়ার মত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আর নেই বলেই এ-কথা বললুম। এদেশে কবির কবিতার সব শব্দগুলো পাট্‌কেল হয়ে ফিরে আসে আর তা' আঘাত করে তার বুকে। অবশ্য সব কবিই যে 'ইট' লেখে এবং তা' পাট্‌কেল হয়ে ফিরে আসে, তা' নয়। যারা ফুল ফোটায় তাদের মাথাই সবচেয়ে অ-নিরাপদ।···

তোদের একটি 'মুশায়েরা'র বৈঠক বসে তোর অল্পপরিসর কামরাটিতে—শুনলুম। বড় খুশী হয়েছি শুনে। তোদের আরম্ভ এম্‌নি ক'রেই হোক। বিপুল জগৎকে জানবার আকাঙ্ক্ষা শিশুর দুরন্ত চলায় গোপন থাকে। পা যখন হবে শক্ত তখন সে আপনি টেনে নিয়ে যাবে শিশুকে বিরাট বিস্ময়ের অন্তরে। তোদের কাপের চায়ের রসটুকু প্রাণের চুঁয়ানরসে মদির হয়ে ওঠে যে, একি কম সৌভাগ্যের কথা? আরম্ভের এই আনন্দ মাঝখানে গিয়ে তিক্ত হয়ে ওঠে, ঈর্ষায় বিস্বাদ হয়ে ওঠে,—এ আমরা অনুভব করছি—যারা মাঝখানে এসে পৌঁছেচি। আমাদের আরম্ভের আনন্দ তোদের চেয়ে কম ছিল না। অন্ততঃ দুরন্তপনা কম ছিল না। ফুল ফোটাবার আনন্দ যদি বিশ্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় তা' হলে তার পরিণতি ট্র্যাজিডিতে। আনন্দ-লোকে দ্বন্দ্ব নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এ যারা ভোলে, তারা চালের গুদাম খুলুক গিয়ে—ফুলের বেসাতি না ক'রে। তোদের চলা আজো শুরু হয়নি, আজো তোদের ফোটার আনন্দ

কুঁড়ির প্রাকারে গুমরে মর্‌ছে—তাই এই সাবধান ক'রে দেওয়া। উপদেশের বেত উঁচাইনি আমি।

তোর খাটুনি দুনো। তোকে খুব আত্মরক্ষা ক'রে চলতে হবে। এটা আমি খুব বুঝি যে, কবিতা গান লেখা যায় হয়ত দিনে একশটা, কিন্তু হিসাবে লেখা যায় না এক পাতা। ফুল কুড়ান যায় ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু বেগুন বোধহয় এক ঝুড়ির বেশী তোলা যায় না। অবশ্য আমার এ মত তাঁদের জন্য নয়, যাঁরা কেয়াফুলের চেয়ে ভুট্টাকে বেশী দামী মনে করেন।...কবিতা লেখার একটা সোয়াস্তি আছে, কেননা তা' লেখা যায় কাছা খুলে, কিন্তু হিসাব লিখতে হয় কাছাকোছা এঁটে, যেন একটা পাইও এধার ওধার না হয়।

এই হিসাবের আয় বে-হিসাবের দুটো বিপরীত মুখকে যে তুই কি ক'রে মিল খাইয়েছিস, তা' ভেবে আমি অবাক হই। তার উপর তুই পড়ছিস। তুই পড়ছিস, লিখছিস, হিসাব লিখছিস। এই তিন শঙ্কায় পড়ে ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়িসনে যেন, এই আশীর্বাদ করি। তোর হিসাবের ফিরিস্তি গরমিল হোক বা চুলোয় যাক—আমার তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কাব্যের ফেরেশ্‌তা বেঁচে থাকুক—এ প্রার্থনা আমি চিরকাল করব। অবশ্য ফেরেশ্‌তা কখনও পটল তোলেনি, তুলেছে মুদি বা বেনে। ফেরেশ্‌তা অমর, কিন্তু অনেক পট্‌লাবেনেকে পটল তুলতে আমি স্বচক্ষে দেখিছি।

পড়া ছাড়িস্‌নে তুই, তা হ'লে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হ'তে আমি বলছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজি তো আমার থাকা চাই। পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ; কবি বিলোয়, সে দাতা। কবি নেয়, কিন্তু সে দান করে,—নদীর মত সে চলে গাইতে গাইতে, দান ক'রে ক'রে দু'পাশে ফুল ফুটিয়ে। পণ্ডিত নেয়, মাড়োয়ারীর ভুঁড়ির মত, ওর পরিধি শুধু বেড়েই চলে নিয়ে নিয়ে, ও আর দিতে চায় না, তাই ওর মরণং ধ্রুবঃ। মাড়োয়ারীর নিলে সে নালিশ করে, নদীর নিলে সে খুশী

হয়। জরদ্গবের মত তোর পেটটা গজ্ গজ্ করুক বিদ্যেয়, এ আমি বলছিনে। তাই বলে জানতে-শুনতে যতটুকু জানা-শোনার দরকার—তা' থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে রাখবি কেন? কত ফুল কত পাখী কত গান কত রঙ্—এ আমি উপভোগ করব না?

চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ এটা হয়ে উঠছে প্রবন্ধ—যাকে করিব ভয় করে। ক্লাসে ওর দরকার আছে, কিন্তু মুশায়েরায় ওর প্রবেশ নিষেধ। ফুলের ভাষা, কুঁড়ির ব্যথা, পাতার কথা, লতার আবেগ, তরুর বাণী আমরা শুনতে পাই, বুঝতে পারি বলে আচার্য জগদীশের ল্যাবরেটরী দেখতে যাইনে। তরুলতাকে মেরে ছুঁচ ফুটিয়ে তার হাসি-কান্না দেখার প্রবৃত্তি আমার নেই।

ক'দিন বেশ কাট্‌ল। প্রাণতোষটা আজ চ'লে যাচ্ছে। আবার প্রবেশ করব কাব্যলক্ষ্মীর হারেমখানায়।

আমি শীগ্‌গীর কলকাতা যাব, তখন দেখা হবে। তোদের মুশায়েরার সব রস-পিপাসু হৃদয় ক'টিকে অভিনন্দন করছি আমি। তোরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ ও স্নেহ-ইচ্ছা নে। তোরা সুন্দর হয়ে ওঠ। ইতি।—

নিত্য-শুভার্থী
কাজীদা।

॥ ২৬ ॥

[শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
১১ই মাঘ, ১৩৩৩

মুরলীদা!

তোমার চিঠি পেলাম।...আমার জ্বর ছেড়েছে, দুর্বলতা সারেনি। কলকাতা গিয়েই জ্বরে পড়ি। অবশ্য যেতে হয়েছিল পেটের

জ্বালায়।…'কল্লোলে' গিয়ে সেখানেই শয্যা নিই জ্বরে। তারপর 'সওগাত' অফিসে গিয়ে তিন-চারদিন আর উঠতে পারিনি।… সেখানে অসুবিধা হওয়ায় জ্বর নিয়েই চলে আসি। তাই আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।—'কালিকলম' ঠিক সময়ে বেরুবে নিশ্চয়। ফাল্গুনের 'কালিকলমে'র জন্য কী লিখব ভাবছি।—'বঙ্গবাণী'র উত্তর যদি পাও কিছু, জানাবে। ভয়ানক দুর্দিন আমার এ-বছর। অথচ কোথায় একটু নড়লে-চড়লেই জ্বর আসে।

…তুমি একা পড়েছ—খুব খাটুনী পড়েছে, না? ভালবাসা নিও। বাড়ীর আর সকলে ভাল। চিঠি দিও অবসর ক'রে।

নজরুল।

॥ ২৭ ॥

[খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

১০. ২ ২৭

স্নেহভাজনেষু,

মঈন! বহুদিন তোকে আর পত্র দিতে পারিনি! আবার জ্বরে পড়েছিলাম। কাল জ্বর-শয্যা ছেড়ে উঠেছি। আজ-ও 'গাজী আবদুল করিম' কবিতাটা শেষ করতে পারিনি জ্বরের জন্য। আজ কিংবা কাল শেষ করবো ইচ্ছা আছে। জ্বরে আমার শরীর ও মনের ক্ষতিই করলে না শুধু, কাব্যেরও বড় ক্ষতি করলে। নাসিরুদ্দীন সাহেব না জানি কী মনে করেছেন। তুই বুঝিয়ে বলিস তাঁকে। তাঁকে আলাদা পত্র দিলাম না, একেবারে কবিতার সঙ্গে চিঠি দেবো বলে অপেক্ষা করছি। তিনি এতদিনে বোধহয় বাড়ী হতে ফিরেছেন। ফাল্গুনের 'সওগাতের' কতদূর? এখানে আর সব ভাল। হ্যাঁ, Variety entertainment-এর কতদূর কী করলি জানাবি।

যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল আমার পক্ষে। কেননা, আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে কি পারবিনে? নাসির সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানাস। আমি সেইরূপভাবে প্রস্তুত হব। আশাকরি ভাল আছিস। অন্যান্য খবর দিস। স্নেহাশীষ নে। ইতি—

শুভার্থী

নজরুল।

॥ ২৮ ॥

[১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয়; সম্মেলনের উদ্বোধন করার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে আমন্ত্রণ করা হয়। সেই উপলক্ষে সাহিত্য সমাজের সম্পাদককে কবি এই পত্রখানি লেখেন।]

কৃষ্ণনগর

১০. ২. ২৭

প্রিয় আবুল হোসেন সাহেব!

আপনার সাদর আমন্ত্রণ-লিপি নব-ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতই খুশ্-খবরী নিয়ে এসেছে। আমার শরীর জ্বরের উপর্যুপরি আক্রমণে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। তাই মন আমার এ আনন্দ-বার্তা পেয়ে যত হাল্‌কাই হয়ে উঠুক, শরীর হয়ত তেমন হাল্‌কা হয়ে উঠতে পারছে না। আর শরীর যদি অমনি ভারী হয়ে থাকে আর কিছুদিন, তা' হলে এর ভার কোন রেলগাড়ীই বইতে সমর্থ হবে না। আমার বর্তমান অভিভাবক জ্বর, তারই আদেশের প্রতীক্ষা করছি।

বসন্তের হাওয়া জরা ও জ্বর সইতে পারে না। তাই আশায় বসে আছি, কখন আসবে দখিন হাওয়া,—আসবে আমার রোগ-শয্যায় ফুলের আমন্ত্রণ-লিপি।

আপনাদের আনন্দ-মহ্‌ফিলে আমার বাঁশী যদি নাই বাজে তা' হলেও আপনাদের খুশীর 'জাম' অপূর্ণ থাকবে না। ঢাকার অতগুলি কবি-কিশোরের কচি-কণ্ঠের সুরে সুরে আপনাদের সুরলোক মস্‌ত্‌ হয়ে উঠবে। এ আমি অত্যুক্তি করছিনে।—আপনাদের উৎসব দিনের 'মুতরিব' হবার গৌরব আমায় দিতে চান; কিন্তু যে গান আমি গাঁথব, তার সুর যে আপনাদের মনের বেণুকুঞ্জে। কোন্‌ আনন্দ-মানিক আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি, কোন্‌ বেদনা-সুন্দর এর দেবতা, কোন্‌ প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পূজা-বেদী—এর আভাস না পেলে আমি কি ক'রে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকে গাইতে হয় এ আনন্দ-জলসার আগমনী, তা' হলে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা—যাকে কেন্দ্র ক'রে সুর-লক্ষ্মীর নৃত্য চলবে—শীগ্‌গীর জানাবেন।

আর আমার বাণী? তার প্রকাশ কি শোভন হবে আপনাদের নৌরোজের মজলিশে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী,—বেদনা-শতদলে তাঁর চরণ। যুগযুগান্তরের অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়েছে তাঁর পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ-উৎসবের নৌরাতির দীপশিখা নিবে যায় এর হতাশ্বাসে। তবু হয়ত সে দুঃস্বপ্ন দেখার মত সুন্দরের নেশায় আনন্দ-গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর! বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্ত্যের শকুন্তলা—বিরহ-শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি!

আপনি আমার লেখা পড়ে মনে করেছেন, হয়তো আবার আমার জ্বর এসেছে। নৈলে এত বকছি কেন?

আপনারা যদি নেহাৎ না ছাড়েন, যেতেই হবে। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, তাতে আপনাদের উৎসব-রজনী বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। আপনার পত্র পেলে সেইরূপ ব্যবস্থা করব।

আমার আন্তরিক প্রীতি ভালবাসা নেবেন সকলে।

আপনাদের সুন্দর-পূজার আয়োজন সার্থক হোক, সুন্দর হোক, পূর্ণ হোক্। ইতি—

প্রীতিসিক্ত

নজরুল ইসলাম।

॥ ২৯ ॥

[শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

১১. ৩. ২৭

স্নেহভাজনেষু,

ব্রজ! আগামী পরশু রবিবার রাত্তিরে আমার খোকার মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করছি। কলকাতার ও স্থানীয় অনেক বন্ধু আসবেন। তুমি সেদিন অবশ্য এসো। না এলে দুঃখিত হব। হয় সকালের চট্টগ্রাম মেলে কিংবা দুপুর ১টা ৩৪ মিনিটের সময় Calcutta-মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জারে আসবে। এই দুটি ছাড়া আর ট্রেন নেই। এলে অন্যান্য কথা হবে।

তোমার প্রেরিত টাকা চব্বিশটা পেয়েছি। 'ফনিমনসা'র প্রুফ পেলাম আজ। স্নেহাশীষ নাও। ইতি—

শুভার্থী

নজরুল।

॥ ৩০ ॥

[শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

২০. ৪. ২৭

স্নেহের বর্মণ!

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ Slow fever আসিতেছে। গোপালের টাকা পাঠাইবার কথা ছিল। আজও টাকা পাঠাইল না। বাড়ীতে একটা পয়সাও নাই। তুমি পত্র-পাঠ মাত্রই অন্তত কুড়িটি টাকা T. M. O. করে পাঠাও! নৈলে বড় মুশকিলে পড়িব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নাই। টাকা না পাঠাইলে বড় বিপদে পড়িব। বহু দেনা করিয়াছি, আর টাকা পাওয়া যাবে না ধার এখানে!

তোমার

কাজীদা।

॥ ৩১ ॥

[১৯৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের কাছে লেখা অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খানের 'একখানি পত্র' প্রকাশিত হয়েছিলো; সেই পত্রের উত্তরে ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগাত'এ নজরুলের এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।]

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা আমার সে-সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্র পরিধিই হোক। কাজেই আমারও একটা দিন অন্তত: তিনটে বছরের কম যে নয়, তা' অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে ১৯২৭-এর সাথে সাথে হয়ত বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমিও আমার অজ্ঞাতে কোন অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেননা, আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদনাম আমার শক্রতেও দিতে পারবে না—বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে—এ সুসংবাদটা উপভোগ করবার মত সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়ত করিনে, কিন্তু আমারই স্বজাতি তর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ-বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি তার জন্য অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে নিঃশ্বাস মোচন করেন, তা' হ্রস্ব নয় এবং সে নিঃশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়! হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে—মন্দ লোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে, তাঁরা আমার শক্র। কারণ, একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে তা আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশীই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে—তা-ও আমি ভাল করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি—ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত

করবে, চির রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই।

কিন্তু এ তো আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তার প্রত্যুত্তর দেবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছুই হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হলেও শোনার ক্রটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশী ক'রে, কিন্তু জান্‌তে যে আজও পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাঙলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল না তখন আর যে হবে সে আশা রাখিনে। বিশেষ ক'রে— আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালই হয়েছে—অন্ততঃ আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়; আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি অন্তরে অন্তরে

প্রার্থনা করছি, কাছে থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্ততঃ তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তা' ছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে খুশী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে-সূর্যালোক ঘরে আসে তা' আলো দেয়, কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়ত আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোন আশা নেই, বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তা' হলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক—যিনি মানুষের দোষ-গুণ বানিয়ার মত ক'রে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তাঁর কাঁচি-পাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনদিনই অনুকূল নয়; তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু! জানেনই তো, আমরা কাণাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাক করে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না;—মুদিওয়ালা তো নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে তুল দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে; কিন্তু তার পাঁচসিকা মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি-পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোন আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদ্দার। থাকৃত বড় বড় মিঞাদের মত সহায়-সম্বল, তা' হলে এ-অভিযোগ করতাম না।

পায়া-ভারী লোকের ভারী স্থবিধে। তা' সে পায়া-ভারী পায়ে ফাইলেরিয়া-গোদ হয়েই হোক, বা ভার গুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে ক'রে, আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভূঁই-সমান নীচু ক'রে। ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানীর বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজের দোকানে ভিড়াতে তার দোকানের সবটুকু তেল তাঁর ভারী পায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে ক'রে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারী পায়ে ঢালে তৈল,—তা' সে পা যতই কেন ঘানি-গাছের মত অবিচলিত থাক। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতি-গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।

যাক এখন এসব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মত অসঙ্কোচে, 'তুমি' বলতে পারলাম না বলে ক্ষুণ্ণ হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগাঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না (পেটে বোমা মারার উপমাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে)। যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহিম খানকে 'তুমি' বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। আরে বাপ্! স্কুলের হেডমাষ্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জল তেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরও কত ভীষণ! আমার স্কুল-জীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে "লাষ্ট বয়" হয়ে যেত —সেও দিতে পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়ত আজও বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাষ্টার মশাই হাই বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন!

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, তাকে আপনি সাধ্য-সাধনা করেও 'তুমি' বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাঙলার মুস্‌লমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব ক'রে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুস্‌লমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা' আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার ব'লে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াস-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম।

হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে-স্নেহে যে নিবিড়-প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি তা' হলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু-সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও ক'রে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদেরে আঙুল দিয়ে গোণা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তা' ছাড়া, আজকার সাম্প্রদায়িক মাত্‌লামির দিনে আমি যে মুস্‌লমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,—আমি যত বেশী অসম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুস্‌লমানের দিক থেকেই এসেছিল—এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুস্‌লমানেরা যে আমায় কদর করেন নি, এটাও ঠিক নয়।

যাঁরা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুস্‌লিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ—মাথার মণি হয়ত পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি! আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই নেতা ইবরাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলি, আবুল হোসেন। আর এই বন্ধুরাই তো আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন—প্রীতির আসন! ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণেরই দল। অবশ্য, এ তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—শুধু যে লিখে তা' নয়,—আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ যেটুকু আছে, তা' ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোন-দিন হয়েছি—এ-বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশ-সেবার সমাজ-সেবার, 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে এই সে-দিনও পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি :

"Behold, I do not give a little charity,
When I give, I give myself."

তা হ'লে সেটাকে অহঙ্কার ব'লে ভুল করবেন না।···

আপনি সমাজকে "পতিত, দয়ার পাত্র" বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি—কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনি। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটীর আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য ক'রে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে প'চে ওঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভর করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা' শুনে রোগীরও খুশী হয়ে উঠবারই কথা। কিন্তু বেচারী 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র-চিকিৎসক তা বিশ্বাস ক'রে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে; রোগী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য ক'রে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা ক'রে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে, তা' সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ

ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট, আর মার সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে তো এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নতুন সাহিত্য, এরাই আনবে নতুন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা বতাজা'র গান।

আপনি হয়ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মত আমিও ভাবি, আজও ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি, আজো বলছি—সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী—তাঁরই আগমনী গান। আমি তাঁরই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয়, সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে গেয়ে চলেছি—জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তার দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলেছি। এ-বিশ্বাস কোথা হতে কি ক'রে যে আমার মাঝে এল, তা' আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয় কার যেন আদেশ—কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমারও ঊর্ধ্বে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়ত চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনও মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাঁকে ধরতে পারি।

আপনার "হাত বাড়াবে কি?" কথাটা আমায় সত্যিই

ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিন্ত শান্তি—যার ধ্যানলোকে বসে আমি তপস্যাপ্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ-জীবনে পাব কি না জানি না; যদি পাই—আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সেদিন।

আপনার ক'টি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে-দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির, না সমাজ-সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জান্‌লেও মানিনে।

"এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে"—এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বল্‌গা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল—এ-কথা মানতে আর্টিষ্টের হয়ত কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে চটে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীনপন্থাদেরে। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণী হ'তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে ব'লে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও-কান্না হাততালি দেবার মত কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিষ্টিকভাবে নেচে নেচে কাঁদ! সকল সমালোচনার উপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইট্‌ম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল!

আমার হয়েছে সাপে ছুঁচো গেলা অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে বলে—কাব্য হ'ল না; 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট' লিখলে বলে—ও হ'ল ন্যাকামী! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কী? ও না লিখলে কার ক্ষতি হত?

'লিরিক' নাকি 'লভ্' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই (হিন্দু-মুস্‌লমান যুদ্ধ ছাড়া); কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা 'বীভৎস বিদ্রোহ-রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজ-লভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকরা রসের চর্চা করে।

"আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই"—এ বদনাম সহ্য করতে হয়ত কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়ত—যখন মানুষের দুঃখ আজকের মত এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হল বেদনার মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-ওস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত "বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র-রসের" প্রাধান্য থাকলেও তা' কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েট্‌স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপ-স্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়,—পুশ্‌কিন, দস্তয়ভ্‌স্‌কি, হুইট্‌ম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে; এই তো আমাদের সাধনা!

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার

গান গেয়েছি,—সে-গানে হয়ত রূপ-রঙ্ ফুটে ওঠেনি আমি ভাল রংরেজ নই বলে; কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মত নীচতা মানুষের কেমন ক'রে আসে। অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোন প্রতিবাদও ত হতে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না—আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্ততঃ আমি তো জানি, আমার এই ত চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই তো সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবী ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি না-ই দেয়, কাঁটার পথেই চলব সমস্ত মারকে সহ্য ক'রে। অন্ততঃ পথের মাঝ পর্যন্ত ত যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে-মালার অবমাননা-ই বা করব কেমন ক'রে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব—পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম ক'রে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝক্‌মকানিটাকেই দেখাইনি—এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্য তো আমি বিদ্রোহী! আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে করেই।

যাক্। আগেই বলেছি, ঐ কুম্ভকর্ণ মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যে-সব পলিসির উল্লেখ আছে, তা' একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ ক'রে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বলবেন, কুম্ভকর্ণ না হয় জাগল ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে রকম 'হাঁ'টা করবে, সে 'হাঁ' তো সঙ্কীর্ণ নয়, তখন! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে 'জলপানি' করবে, যারা তাঁর ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতই তো মরেছে, না হয় আরো দু-দশটা মরবে! আপনি বলবেন, ভয় তো ঐ-খানেই, বন্ধু! বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তা' হলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আস্‌হাব কাহাফে'র মত রোজ কিয়ামত তক্ ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন! কারুর পান থেকে এতটুকু চূণ খস্‌বে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না; তেল কুচকুচে নাদুসনুদুস ভুঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে—এ আশা আলেম সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মত শুনাবে কিন্তু বড় দুঃখে দেখে-শুনে তেতো-বিরক্ত হয়ে এ-সব বলতে হচ্ছে। তাই তো বলি যে, 'বাবা! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় তো এদেরই একজনের হাতে মর বেশ একটু হাতাহাতি ক'রে; তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভাল।' কথাগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহু আকবর', 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিও করে; কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোন শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন ক'রে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন ক'রে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কারপ্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নূতন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী-আগ্রা-ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তের—পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুস্‌লিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয় তো। ওর মানে কি মুস্‌লমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুস্‌লিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা' সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইস্‌লাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্যরচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইস্‌লাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইস্‌লামের সত্যকার প্রাণশক্তিঃ গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইস্‌লামের এই অভিনবত্ব শ্রেষ্ঠত্ব আমি তো স্বীকার করিই, যাঁরা ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইস্‌লামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র ক'রে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইস্‌লামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে-গানের সুর। উঠতে পারেও না। তা' হলে তা' কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে

কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা' আমি বুঝতে পারি—কিন্তু সমাজ যা চায়, তা' সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও—

"আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার॥"

রীতিমত কাব্য। বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হল, মাজাও দুল্‌ল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল। যাক, বাঁচা গেল!—কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারী ভবনদীর এ পারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে—মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বই জন—তারা বলে, কমলবন টমলবন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেওভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ-অবস্থায় কি করব বলতে পারেন? আমি 'হুজ্জতুল্ ইস্‌লাম' লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব?

এরা যে শুধু হুজ্জতুল্ ইস্‌লামই পড়ে, এ আমি বলব না; রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়েছে—

"ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।"

"লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার।
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার॥"

আর এই কাব্যের চরণ পড়ে 'কেঁদে' ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত—

"কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া।
আর লগির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল্ হামারা ঘোড়া।"

পড়তে পড়তে আনন্দে গদগদ্ হয়ে উঠেছে।

বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু, আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি।

সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনাসঞ্চার হয়, তা' হলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এই ভালবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কি না, সেইটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন সমাজকে,—তা' সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারান নি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ ক'রে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাঙলার মুস্‌লমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ!

হিন্দু-মুস্‌লমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে, এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইস্‌লামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতীদল এর এক-একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পূর্ণ শান্তি কোনদিন পাইনি। যদি পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষ যেন করতে পারি—তাই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি, যাঁরা মনে করেন—আমি ইস্‌লামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইস্‌লামের নামে যে কুসংস্কারের মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে —তাকে ইস্‌লাম বলে না-মানা কি ইস্‌লামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া ক'রে—এছাড়া আমার কি বলবার থাকতে পারে।

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফেজরুমীকে শ্রদ্ধা করেন—এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদের। এরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তা' হলে মুস্‌লমান কবি দিয়ে বাঙলা-সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবিধ পুঁথি ছাড়া।

বাঙলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলাভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্যে হিন্দু-মুস্‌লমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুস্‌লমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুস্‌লমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুস্‌লমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুস্‌লমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী; তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুস্‌লমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।

কিন্তু বন্ধু, এ-কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার উপরও আমার সেই বিশ্বাস

—একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুস্‌লমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না। আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহিত্যিকের, এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা নাই বললাম।

এত অভাবের কোন্ অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজেই—তাতে ক'রে হয়ত কোনোটাই ভাল ক'রে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুন, তা' হলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা' আমাদেরই কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।

কাজী নজরুল ইসলাম।

॥ ৩২ ॥

[নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে লিখিত]

নওরোজ (সচিত্র মাসিক পত্র) কার্যালয়
৪৫বি মেছুয়াবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা
৪. ৭. ২৭

জয়যুক্তেষু—

আপনার স্নিগ্ধ চিঠি না-চাওয়ার পথ দিয়ে এসে আমায় যতো না বিস্মিত করেছে তার চেয়ে আনন্দ দিয়েছে ঢের বেশী।

আমি এতটা আশা করতে পারিনি যে, আমার প্রশংসা আপনার ললাটের প্রদীপ্ত প্রতিভা-শিখাকে উজ্জ্বলতর করবে—বা সোজা কথায় আমার প্রশংসায় আপনার মতো অসীম শক্তিশালী দুরন্ত সাহসী লেখকের কিছু 'এসে যায়'।

আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণশক্তি একটু বেশী। দেখলে তাকে হয়তো গ্রহান্তরেও চিনতে পারি—শুনলে তাকে পথান্তরে চিনতেও বেগ পেতে হয়। কাজেই নন্দকুমার চৌধুরী লেনের দেখা আপনাকে কাব্যের নন্দন-কাননের রাজপথে রেখেও চিন্‌তে আমার এতটুকু দেরী হয়নি। নন্দকুমার চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম—তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি—পূজারী করে তুলেছে। এক-বুক কাদা ভেঙে পথ চলে একদীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী ম'নে করবেন জানি না তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো ক'রে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

নন্দকুমার চৌধুরী লেনে আপনার 'লোমহর্ষণ' নাটকটা শুনেছিলাম কিনা মনে নেই, যখন মনে নেই—তখন ওটাতে হয়তো

'লোমহর্ষণই' হয়েছিল 'প্রাণ-হর্ষণ' হয়নি। হলে নিশ্চয় মনে থাক্‌তো। তার জন্য দুঃখ করিনে, কারণ আপনাকে মনে আছে। শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখ্‌ছি।

পবিত্রের মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—'মুক্তির ডাক'। পড়ে আমার কেমন লাগে, পবিত্র লিখতে বলেছিলেন। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর ক'রে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।

আপনার 'মুক্তির ডাক'-এর পর আমি 'অজগর মণি' ও 'কাজল লেখা' পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকিনি, যাকে পেয়েছি তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালী যাই, সেখান থেকে লক্ষ্মীপুরে গিয়ে সুধাংশু বলে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধহয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সেই আমায় তিনখানা 'বাসন্তিকা' দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি 'সেমিরেমিস,' 'ইলা' ও 'স্মৃতির ছায়া' কি 'ছাপ' পড়ি। 'সেমিরেমিস' পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি—তা' বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি, ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠতো। এ ঈর্ষা এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও—দুঃখিত যতই হই।

ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি—কিন্তু সেমিরেমিসে আমি যেন তলিয়ে গেছি। কতবড় সৃষ্টি।—দুঃসাহসের দিক থেকে বলছিনে—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বলছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এতো বিচলিত করেনি।···আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি বাসন্তিকায়, কিন্তু তার সবগুলি

পড়ে উঠবার সুযোগ সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করছি।

আমার ভয় হয়, উকিল মন্মথ সেমিরেমিসের মন্মথকে ভস্ম না করে ফেলে। 'ল' আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।...

আমি ইঙ্গিত দিতে কী পারবো আপনার মতো শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে? আমার মনে হয় 'তাজমহল' সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে, তা' সত্যিকার তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেমিরেমিসের স্রষ্টাকে এ লিখতে এতটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। আপনার মত জান্‌লে খুশি হব।

'নওরোজ' বেরিয়েছে—ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন—তবে তিনি 'নাজিরুল', নজরুল নন,—আকার ইকারের দণ্ড ধারণ ক'রে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভালো লেখা পড়ে তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন। সত্যিই অনেক বক্‌লাম—আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেল। তবে বকাটা বড্ডো তাড়াতাড়ি হলো—তাই এ বকাটা বোকার মতই মনে হবে।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

'নবনাটিকা' দর্শনাকাঙ্ক্ষী

নজরুল ইস্‌লাম।

P. S. আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি নওরোজের হাটে সওদা করতে আসার জন্য। দেরী করলে চলবে না। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

॥ ৩৩ ॥

[১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। কবি নজরুল ইস্‌লাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, সেই উপলক্ষেই "চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" গানটি রচনা করেন। সে-সময় তিনি

কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সাহিত্য-সমাজের তিনি তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে এই পত্রখানি লেখেন।]

পদ্মা

২৪. ২. ২৮

সন্ধ্যা।

("Vulture"—ষ্টীমার)

প্রিয় মোতাহার!

আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধ হয় ব্রাউনিং-এর) একটা লাইন,—

How sad and bad, mad it was,—
But then, how it was sweet!

আর, মনে হচ্ছে, ছোট্ট দু'টি কথা—'সুন্দর' ও 'বেদনা'। এই দু'টি কথাতেই আমি-সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি।...

'সুন্দর' ও 'বেদনা', এই দু'টি পাতার মাঝখানে একটি ফুল—বিকশিত বিশ্ব!...

একটি মক্ষীরাণী, তাকে ঘিরেই বিশ্বের মধুচক্র।...

বাগানের মালি রাত-দিন লাঠি নিয়ে বাগান আগলে আছে। বেচারা মানুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। মৌমাছি তার মাথার ওপর দিয়ে গজল-গান গেয়ে বাগানে ঢোকে, সুন্দরের মধুতে ডুবে যায়, অফুট কুঁড়ির কানে বিকাশের বেদনা জাগায়, প্রস্ফুটিত যে—তাকে ঝরে পড়ার গান শোনায়;—তার এতটুকু বাধে না, দেহেও না, মনেও না। বেচারা মালি—যেন অঙ্কশাস্ত্রী মশাই! হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখে, আর মৌ-মক্ষীর চরিত্রের এবং 'আরো-কত কি'-র আলোচনা জুড়ে দেয়! মৌ-মক্ষী কিছু শোনে না, সে কেবলি গান করে—সুন্দরের স্তব সে গান। তাকে মারো, সে সুন্দরের স্তব করতে করতেই মরবে। কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই।

তাকে আবার বাঁচিয়ে ছেড়ে দাও, সে আবার সুন্দরের স্তব করবে, আবার বাগানে ঢুকে ফুলের পরাগে অন্ধ হয়ে ভগ্নপক্ষ হয়ে মরবে।

সুষমা-লক্ষ্মীর বাগান আগ্‌লে বসে আছে নীতিবিদ্ বুড়ো সামাজিক হিতকামীর দল,—ষ্টার্ণ, রিজার্ভ, রিজিড, ডিউটিফুল! কত বড় বড় বিশেষণ তাদের সামনে ও পিছনে! তারা সর্বদা এই "পোজ" নিয়ে বসে আছে যে, তারা যদি না থাকত, তা' হলে একদিনে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত, একটা ভীষণ ওলটপালট হয়ে যেত!··· বেচারা! দেখলে দয়া হয়।

এদের মাঝেই—হয়তো কোটির মাঝে একটি—আসে সুন্দরের খেয়ালী, কবি। সে রিজার্ভ নয়, ডিউটিফুল নয়, সে কেবলই ভুল করে, সে কেবলি falls upon the thorns of life, he bleeds! সে সমস্ত শাসন, সমস্ত বিধিনিষেধের উর্ধ্বে উঠে সুন্দরের স্তব-গান করে skylark-এর মতো। সে কেবলি বলে, "সুন্দর—বিউটিফুল!" মিল্টনের স্বর্গের পাখীর মতো তার পা নেই, সে ধূলার পৃথিবী স্পর্শও করে না।···

কবি এবং মৌ-মক্ষী! বিশ্বের মধু আহরণ ক'রে মধু-চক্র রচনা ক'রে গেল এরাই।

কোকিল, পাপিয়া, 'বৌ-কথা-কও', 'নাইটিঙ্গেল্', বুলবুল ডিউটিফুল বলে এদের কেউ বদনাম দিতে পারেনি। কোকিল তার শিশুকে রেখে যায় কাকের বাসায়, পাপিয়া তার শিশুর ভার দেয় ছাতারপাখীকে, বৌ-কথা-কও শৈশব কাটায় তিতিরপাখীর পক্ষপুটে! তবু, আনন্দের গান গেয়ে গেল এরাই। এরা ছন্নছাড়া, কেবলি ঘুরে বেড়ায়, শ্রী নাই, সামঞ্জস্য নাই, ব্যালেন্স-জ্ঞান নাই: কোথায় যায়, কোথায় থাকে—ভ্যাগাবণ্ড্ একের নম্বর! ইয়ার ছোকরার দল! তবু এরাই তো স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দিল, সুন্দরের বৈতালিক, বেদনায় ঋত্বিক—এই এরাই, শুধু এরাই! কবি আর বুলবুল!

কবি আর বুলবুল পাপ করে, তারা পাপের অস্তিত্বই মানে না বলে। ভুল—ভুলের কাঁটায় ফুল ফোটাতে পারে বলে।

আমার কেবলি সেই হতভাগিনীর কথা মনে পড়ছে—যার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে "ভিউটিফুল", আর পায়ের তলায় প্রস্ফুটিত শতদলের মতো—"বিউটিফুল!" পায়ের তলার পদ্ম—তার মৃণাল কাঁটায় ভরা, দু'দিনে তার দল ঝরে যায়, পাপড়ি শুকিয়ে পড়ে—তবু সে সুন্দর! দেবতা গ্রেট হতে পারে—কিন্তু সুন্দর নয়। তার আর-সব আছে, চোখে জল নেই।

তুমি মনে করতে পার মোতাহার—আমারই চিরজনমের কাব্যপ্রিয়া আমারই বুকে শুয়ে কাঁদছে তার স্বর্গের দেবতার জন্য! মনে কর—সে বলছে—আমায়—মাটীর ফুল আর তার দেবতাকে—আকাশের চাঁদ! আচ্ছা, এমনি ক'রে তোমায় কেউ বললে তুমি কী করতে বল তো!

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি একসঙ্গে কবি এবং নজরুল। ঐ কথা শুনে কবি খুশী হয়ে উঠল, বললে—"এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, 'তোমায়' এর ঊর্ধ্বে, তোমার দেবতারও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাব আমি—আমি তোমায় সৃষ্টি করব!"

কিন্তু নজরুল কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। মনে হলো সারা বিশ্বের অশ্রুর উৎস-মুখ যেন তার ঐ দুটো চোখ। নজরুলের চোখে জল! খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, না? এই চোখের দু'ফোটা জলের জন্য কত চাতকীই না বুক ফেটে মরে গেল! চোখের সামনে!

তুমি ভাবছ—আমি কী হেঁয়ালী! কী সব বকছি—যার মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পাবে না। সত্যই পাবে না। বুকের গোলক-ধাঁধায় কখনো কি ঢুকেছো বন্ধু? ওর পথ নেই, সমাধান নেই, মাথামুণ্ডু মানে—কিছু না!

ওর মাঝে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে শিশুর মতো কাঁদা ছাড়া আর কোনো কিছু করবার নেই!

তুমি হয়তো পরজন্ম মানো না, তুমি সত্যান্বেষী গণিতজ্ঞ। কিন্তু আমি মানি—আমি কবি।

আমি বিশ্বাস করি যে, সে আমায় অমন ক'রে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্মজন্মান্তরের, লোক-লোকান্তরের দুখ-জাগানিয়া বন্ধু। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়াছাড়ি।

তুমি হয়তো মনে করছ—বেচারা শেলী, বেচারা কীট্‌স, বেচারী নজরুল! কেঁদেই মরল!

রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, "দেখ্ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মতো কীট্‌স্-এর মতো খুব বড় একটা tragedy আছে, তুই প্রস্তুত হ!" জীবনে সেই ট্রাজেডি দেখবার জন্য আমি কতদিন অকারণে অন্যের জীবনকে অশ্রুর বরষায় আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছি, কিন্তু আমারই জীবন রয়ে গেছিল বিশুষ্ক মরুভূমির মতো তপ্ত—মেঘের ঊর্ধ্বে শূন্যের মতো। কেবল হাসি কেবল গান! কেবল বিদ্রোহ! —যে বিপুল সমুদ্রের ওপর এত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, এত ফেনপুঞ্জ, তার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকার তলার কথা কেউ ভাবে না। তাতে কত বড় বড় জাহাজ-ডুবি হলো সেইটেরই হিসাব রাখলে শুধু,—আর সে যে কত যুগ ধরে আপনার অতল তলায় বসে কেবলই শুক্তির পর শুক্তির বুকে মুক্তা-মালা রচনা ক'রে গেল এবং আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রইল তার সেই মুক্তা-মালা,—এ খবর কেউ রাখ্‌লে না!

ফরহাদ, মজনুঁ, চন্দ্রাপীড়, শাজাহান—এরা যেন এক-একটা দৈত্যশিশু। কিন্তু স্বর্গকে আজো ম্লান ক'রে রেখেছে এরাই।—ফরহাদ পাগলটা শিরি'র কথায় একটা গোটা পাহাড়কেই কেটে ফেল্‌লে! পাহাড়ের সব পাথর শিরি' হয়ে উঠল। প্রেমিকের ছোঁয়ায় পাহাড় হয়ে উঠল ফুলের স্তবক। পাষাণের স্তব-গান উঠল ঊর্ধ্বে! কোথায় স্বর্গ। কোন্ তলায় রইল পড়ে!

লায়লি—সাধারণ মেয়ে, মজনুঁ তাকে এমন ক'রে সৃষ্টি ক'রে

গেল, যেমন ক'রে—দেবতা তো দূরের কথা, ভগবানও সৃষ্টি করতে পারে না!

শাজাহান—আরেক ফর্‌হাদ! মোমতাজকে শিরিঁর মতো অমর ক'রে গেল তাজমহলের মহাকাব্য রচনা ক'রে। তাজমহল—যেন নির্বাক ভাস্করের পাষাণ-স্তব! মর্মরের মহাকাব্য!

এইখানেই মানুষ স্রষ্টাকে হার মানিয়েছে!

আমি চাচ্ছিলাম এই দুঃখ, এই বেদনা। কত দেশ-দেশান্তরে, গিরি-নদী-বন-পর্বত-মরুভূমি ঘুরেছি আমার এই অশ্রুর দোসরকে খুঁজতে। কোথাও "দেখা পেয়েছি"—এই আনন্দের বাণী উচ্চারিত হয়নি আমার মুখ দিয়ে।

তাই তো এবারকার তীর্থযাত্রাকে আমি বারে বারে নমস্কার করেছি। এতদিনে আমি যেন আপনাকে খুঁজে পেলাম। এবারে আমি পেয়েছি—প্রাণের দোসর বন্ধু তোমায় এবং চোখের জলের প্রিয়াকে।

আর আজ লিখতে পারলাম না বন্ধু! বালিস চেপে কি বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়?

তোমার

নজরুল।

॥ ৩৪ ॥

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর

২৫. ২. ২৮

বিকেল।

বন্ধু,

আমি আজ সকালে এসে পৌঁচেছি। বড্ডো বুকে ব্যথা। ভয় নেই, সেরে যাবে এ ব্যথা। তবে ক্ষত-মুখ সারবে কিনা ভবিতব্যই

জানে। ক্ষত-মুখের রক্ত মুখ দিয়ে উঠবে কিনা জানি না। কিন্তু আমার সুরে আমার গানে আমার কাব্যে সে রক্তের যে বন্যা ছুটবে তা' কোনদিনই শুকোবে না।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল Sadness-এর। কিছুতেই Sad হতে পারছিলাম না। তাই ডুবছিলাম না। কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আজ ডুবেছি, বন্ধু! একেবারে নাগালের অতলতায়।

প্রতাপ-শৈবলিনী ভেসেছিল একসাথে, তাদের কূলও মিলল। ভাসে যারা, তাদের কূল মেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু যে ডোবে, তার আর উঠবার কোনো ভরসা রইল না।

তোমাকে দু'দিনেই বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি—তোমার গণিতের পাষাণ-টবে ফুলের চারা পেয়েছি বলে। অদ্ভুত লোক তুমি কিন্তু! নিজেকে কেবলি অসুন্দরের আড়াল দিয়ে রাখছ! তোমাকে আমার নখ-দর্পণে দেখতে পাচ্ছি।—নিঃস্বার্থ, কোমল, অভিমানী, প্রেমিক—কিন্তু সবকে গোপন ক'রে চলতে চাও কেন, তোমার তৃষ্ণা আছে, কিন্তু সিডনীর মতো তোমার তৃষ্ণার বারি অনায়াসে আরেক জনের মুখে তুলে দিতে পার।

তুমি দেবতা! তোমাকে যদি কেউ ভুল করে, তবে তার মতো ভাগ্যহীন আর কেউ নেই।...

তুমি ভাবতে পার যে, সুন্দরই যার ধ্যান, সেই নারী রাস্তায় বসে দিনের পর দিন পাথর ভাঙবে, আর তারই পাশে সমানে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে কর্তব্যপরায়ণ ষ্টার্ণ একটা লোক? এবং ঐ পাথর-ভাঙিয়ে লোকটা মনে করবে—সে একটা খুব বড় কাজ করছে! আর যে-কেউ তাকে দেবতা বলুক, আমি তাকে বলি প্রাণ-হীন যক্ষ। অকারণে ভূতের মত রত্ন-মাণিক আগলে বসে আছে। সে রত্ন সেও গলায় নিতে পারে না—অন্যকেও নিতে দেবে না।

হায় রে মূঢ় নারী! তাকে চিরকাল আগলে রইল বলেই

যক্ষ হয়ে গেল দেবতা। অঙ্কের পাষাণ-টবে ঘিরে রেখে তিলোত্তমাকে তিলে তিলে মারাই যদি বড় দেবত্ব হয়—তবে মাথায় থাক, আমার সে দেবত্ব! আমি ভালোবাসলে তাকে আমার বাঁধন হতে মুক্তি দিই। আমি কবি, আমি জানি কী ক'রে সুন্দরের বুকে ফুল ফুটাতে হয়!

যে যক্ষ রাজকুমারীকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাষাণ-পুরীতে সোনার খাটে শুইয়ে রাখলে, তার অতি স্নেহকে কি দেবত্ব বলে ভুল করব? হয়—তাকে মেরে ফেল, কিংবা ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে দাও। রূপার কাঠির যাদুতে রইল বলেই রাজকুমারী হয়তো যক্ষকে অভিশাপ দিলে না—হয়তো বা দেবতাই মনে করলে! কিন্তু যেদিন না-চাওয়ার পথ দিয়ে এল না-দেখা রূপকুমার, তখন কোথায় রইল 'যক্ষ'—কোথায় রইল পাষাণ-পুরী! আমার মনে হয় কি জানো? ঐ দৈবতার মোহ যেদিন তেপান্তরের রূপকুমারীর ঘুচবে, সেদিন সে বেঁচে যাবে—বেঁচে যাবে।

সে শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই আমি মালা গাঁথব, গান রচনা করব।

যার কল্যাণ কামনা কর, সে যদি কোনোদিন তোমায় দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষদৃষ্টিতে দেখে—তাকেই বরণ ক'রে নিও। তাকে ত্যাগ করো না। এ তোমার শুধু বন্ধুর অনুরোধই নয়, আরো কিছু।

খবর দিও—সব খবর। বুকের ব্যথা হয়তো তাতে কমবে। এখন কী ইচ্ছে করছে জানো? চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে, সমস্ত লোকের সংশ্রব ত্যাগ ক'রে পদ্মার ধারে একা একটি কুটীরে। হাসি-গান আহার-নিদ্রা সব বিস্বাদ ঠেকছে।

তোমার ছেলে-মেয়েকে চুমু দিও—তোমার বৌকে সালাম।

সেরে উঠলে জানাব। তোমার চিঠি চাই।

কয়েকটা ঝরা মুকুল দিলাম, নাও।

তোমার

নজরুল।

॥ ৩৫ ॥

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
১. ৩. ২৮
বিকেল।

প্রিয় মোতিহার!

তোমায় এবার থেকে মোতিহার বলে ডাকব। কাল সকাল সাড়ে দশটায় তোমার এবং তোমার···চিঠি পেয়েছি। কালই উত্তর দিতাম, কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে জ্বরটা ও গলার ব্যথা বড্ডো বেড়ে ওঠায় কিছুতেই বসতে পারলাম না। তোমাদের চিঠি পাওয়ার পর জ্বর আরো বেড়ে ওঠে। সমস্ত দিন-রাত্তির ছিল—আজ ছেড়েছে সকালে। জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু গলার ব্যথা সারেনি। কথা বলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে—আজও উপোস করছি। আল্লা মিঞা রোজা না-রাখার শোধ তুলে নেবেন দেখছি—আচ্ছা করেই।

বড্ডো 'শক' পেয়েছি কাল ওঁর চিঠি পড়ে। শরীর মন দুই অসুখ বলে হয়তো এতটা লাগল—হবেও বা! কেমন লাগল—জানো? বাজপাখীর ভয়ে বেচারী কোকিল রাজকুমারীর ফুল-বাগানে লুকোতে গিয়ে সহসা ব্যাধের তীর বিঁধে যেমন ঘাড়মুখ দুমড়ে পড়ে, তেমনি।

কাল থেকেই কোথায় পালাই কোথায় পালাই করছিল মনটা। দৈব মুখ তুলে চেয়েছে। একটু আগে দিলীপের তার পেলাম,—আমি ফিরেছি কিনা জান্‌তে চেয়েছে। এক্ষুণি তার করলাম—ফিরেছি। কাল দুপুরে কালকাতা যাচ্ছি। এখন সেখানেই দু'দশদিন থাকব। অতএব তোমরা কেউ পত্র দিলে সেখানেই দিও।

আমার কলকাতার ঠিকানা,—১৫ জেলিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

ওখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার (musician) থাকেন। যাঁকে "বাঁধন-হারা" dedicate করেছি।

এর মধ্যে তোমাদের চিঠি এসে পড়লে কলকাতায় redirected হয়ে যাবে—ব্যবস্থা ক'রে গেলাম।

তোমার অভিমান-তপ্ত চিঠি আমার যে কী ভালো লাগছে—তা' আর কী বলবো! কতবারই না পড়লাম—যেন প্রিয়ার চিঠি! ভাগ্যিস্ তুমি মেয়ে হয়ে জন্মাওনি—নৈলে এবার তোমায়ই হয়তো ভালোবেসে ফেলতাম ঢাকা গিয়ে। এমন দর্পণের মতো স্বচ্ছ, শহদের মতো মিষ্টি মন কোথায় পেলে বল তো নীরস গণিত-বিদ্?

কাল তোমার চিঠিটা যদি না এসে পড়তো···চিঠির সাথে,—তা' হলে কি যে হতো আমার—তা' আমি ভাবতেও পারিনে।

সে থাক। আজ যে তোমার চিঠি পাবই মনে করেছিলাম। কেন চিঠি এল না বল তো! আমি রবিবারে তোমায় চিঠি পোষ্ট করেছি এখানে, সে চিঠি অন্তত মঙ্গলবার সকালে পাওয়া উচিত ছিল তোমার। দেরী হয়ে গেছিল বলে Late fee দিয়ে পোষ্ট করতে দিয়েছিলাম। নিজে যেতে পারিনি পোষ্ট করতে—কিন্তু যাকে দিয়েছি সে তো ভুল করে না।

কাল তোমার চিঠি পাবই আশা করছি। বোধহয় নিরাশ হব না। আর, যদি হই, কী আর করব!

তুমি ছাড়া কারুর চিঠি পেতে ভয় করবে আমার—যদি ঐ রকম চিঠি হয়!

তবে, ঐ এক চিঠি পেয়েই যতদূর বুঝেছি—আমায় তিনি দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে দয়া করবেন না।

তোমার চাওয়া গানটা এবং তোমার লেখা (অগ্রদূত) চিঠিটা পাঠালাম। কপি করবার মতো হাতে জোর নেই ভাই। কী যে দুর্বল হয়ে গেছি, তা' ভাবতে পারো না। গলার ভিতর ঘা-ই হলো না কি, solid কিছু খেতে পারছিনে। এর জন্যও অন্তত:

কলকাতা যাওয়ার দরকার আমার। অগ্রদূতের চিঠিটা তোমার দেখা হলে পর আবার আমায় পাঠিয়ে দিও কলকাতায়। ওটার উপর তোমার কোনো দাবী নেই।

বুদ্ধদেব বসুকে একটা কবিতা পাঠালাম। গজল-গানের স্বরলিপিও পাঠাচ্ছি আজকালের মধ্যে—দেখা হলে বলো।

আবুল হোসেন খুব রেগেছেন, নয়? ওঁর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ো। আমি যে কেমন ক'রে ফিরে এসেছি, আমিই জানিনে।

আবুল হোসেন, মিঃ বোরা, কাজী ওদুদ প্রভৃতিকে আমার অপরাধ ক্ষমা করতে বলো।

বুদ্ধদেব খুব রেগে চিঠি দিয়েছে—কেন অমন ক'রে না বলে চলে এলাম, তা' কি আমিই জানি।

আচ্ছা মোতিহার! তুমি কোনোদিন কাউকে ভালো-বেসেছিলে? তখন তোমার কি মনে হতো? খুব কি যন্ত্রণা হতো বুকে? সে ছাড়া জগতের আর সব কিছুই কি বিস্বাদ ঠেকত তখন?

এত সুন্দর এত কোমল—একমুঠো ফুলের মত তোমার মন—হয়তো আজো পিষ্ট হয়নি কোনো বেদরদীর চরণে। তোমার চিঠি পড়ে এক-একবার হাসি পাচ্ছে, আবার খুশিও হয়ে উঠছি যে, তুমি তো পুরুষ মানুষ—তোমারই যদি এই অবস্থা হয় আমায় দেখে, ভালো লেগে—তা' হলে কোনো তরুণী যদি কোনোদিন ভালো-বাসতো আমায়, তা' হলে তার কি অবস্থা হতো!

তুমি এক জায়গায় লিখেছ,—"মনে হয় যেন একটু দুঃখ পাচ্ছি—কিন্তু কি মধুর সে দুঃখ!" এ দুঃখ কি আমাকে পারিয়ে? আমায় বলতে তোমার সঙ্কোচ হবে না নিশ্চয়। 'সেতুই কি শেষে জলে পড়ে গেল?'

আচ্ছা মোতিহার! তুমি যে দেবতার পায়ে "চুঙ্গল" (অবশ্য তোমার এ-কথাটার মানে জানি না) এবং মাথায় শিং

দেখেছ—সে দেবতা কি আমিই? আমার বন্ধুরা আমার গোঁ ও শরীর দেখে আমায় "বাবা তারকনাথের ষাঁড়" বলে গালি দেন—শত্রুরাও অন্ততঃ এই শরীরটার আর শিং দুটোর জন্যই ভয়ে জড়সড় —কিন্তু এরি মধ্যে তুমি এ-কথা জানলে কি ক'রে বল তো! এ জানার "সোর্স" কি অন্য কেউ? তুমি আমার শিং দেখেছ—তিনি তো আমার হয়তো দশটা মুণ্ডু বিশটা হাত দেখেছেন! কোরাণে আছে—শয়তানের চেয়ে সুন্দর ক'রে কাউকে সৃষ্টি করেন নি খোদা। আমরাও বিউটিফুলের উপাসক,—জগতে সুন্দর ছাড়া—পাপ-পুণ্য-মন্দ-ভালোর খবর রাখিনে,—কাজেই শিং যে দেখবে ফুলচন্দন দিতে এসে—তাতে আর বিচিত্র কি!

আচ্ছা, সত্যি ক'রে লিখো তো, আমি যে তোমায় চিঠি দিয়েছি—এ খবর তুমি জেনেছিলে—না দেখেছিলে?

গত বছর এমনি দিনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—ঢাকায়। কিন্তু সে-বার তো তুমি অনেকটা দূরে দূরেই ছিলে। এবার কি খুব বড় একটা দুঃখের ভিতর দিয়েই আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেয়েছি? এ রহস্যের তো হদিস খুঁজে পাচ্ছিনে, বন্ধু! তোমরা গণিতবিদ্, ক্লিয়ার ব্রেণ তোমাদের, হয়তো এর solution খুঁজে পাবে।

"Sympathetic vibration" musicএই আছে জানতাম —ওটা mathematics-এ আছে জেনে mathematics-এ আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, telepathy-টা কি Science-এর না কাব্যের? এমনি দু'একটা জায়গায় এসে—অঙ্কে-কবিতায়-বিজ্ঞানে-সুরে—হৃদয়-বিনিময় হয়ে গেছে বোধহয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে—এইবার নতুন ক'রে মনে হচ্ছে স্রষ্টা—গণিতবিদ্, না কবি? লোকটা এত হিসেবী অথচ এত সুন্দর। আমার বেদনা অনেকটা উপশম হয়েছে এই ভেবে যে, অন্ততঃ একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে আমার পত্রের

প্রতীক্ষায় থেকে—তা' হোক্ না সে পুরুষ। আচ্ছা বন্ধু, এত শক্ত মনের পুরুষ, তার কান্না পায় আমার এতটুকু অবহেলায়,—আর একজন নারী—হোক্ না সে পাষাণ-প্রতিমা—তার কিছু হয় না ? কিন্তু বুঝতে পারছিনে—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু, একজন নারী সে এত নিষ্ঠুর হতে পারে ?

যাক্, আজ ডাকের সময় যাচ্ছে। আবার লিখব···। কলকাতাতে ঐ ঠিকানায় চিঠি দিও। তুমি আমার ভালোবাসা নাও। খোকা-খুকীদের চুমু দিও। ইতি—

তোমার

নজরুল।

॥ ৩৬ ॥

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত]

১৫ জেলিয়াটোলা স্ট্রীট

কলিকাতা

৮. ৩. ২৮

সন্ধ্যা।

প্রিয় মোতিহার !

পরশু বিকেলে এসেছি কলকাতা। ওপরের ঠিকানায় আছি। ওর আগেই আসবার কথা ছিল—অসুখ বেড়ে ওঠায় আসতে পারিনি।

দু'চারদিন এখানেই আছি। মনটা কেবলই পালাই-পালাই করছে। কোথায় যাই ঠিক করতে পারছিনে। হঠাৎ কোন্‌দিন কোন এক জায়গায় চলে যাব। অবশ্য দু'দশদিনের জন্য।

যেখানেই যাই—আর কেউ না পাক, তুমি খবর পাবে।

বন্ধু। তুমি আমার চোখের জলের মোতিহার, বাদল-রাতের বুকের বন্ধু। যেদিন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর এরা সব্বাই আমায়

ভুলে যাবে, সেদিন অন্ততঃ তোমার বুক ব্যথিয়ে উঠবে তোমার ঐ ছোট্ট ঘরটিতে শুয়ে—যে ঘরে তুমি আমায় প্রিয়ার মত জড়িয়ে শুয়েছিলে। অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনাও নিয়ে যেতে পারব—এ কি কম সৌভাগ্য আমার? সেদিন তোমার শয়ন-সাথী প্রিয়ার চেয়েও হয়তো বেশী ক'রে মনে পড়বে এই দূরের বন্ধুকে। কেন এ-কথা বলছি শুন্‌বে?

বন্ধু আমি পেয়েছি—যার সংখ্যা আমি নিজেই করতে পারবো না। এরা সবাই আমার হাসির বন্ধু, গানের বন্ধু। ফুলের সওদার খরিদ্‌দার এরা। এরা অনেকেই আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, প্রিয় হয়ে ওঠেনি কেউ!

আমার চোখের জলের বাদলা রাতে এরা কেউ এসে হাত ধরেনি। আমার চোখের জল! কথাটা শুনলে এরা হেসে কুটিপাটি হবে!

আমার জীবনের সবচেয়ে করুণ পাতাটির লেখা তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমার দিক দিয়ে এর একটা কী যেন প্রয়োজন ছিল!...আচ্ছা, আমার রক্তে রক্তে শেলীকে কীট্‌স্‌কে এত ক'রে অনুভব করছি কেন? বলতে পার? কীট্‌স্‌-এর প্রিয়া ফ্যানিকে লেখা তাঁর কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে যেন এ কবিতা আমিই লিখে গেছি। কীট্‌স্‌-এর সোরথ্রোট হয়েছিল—আর তাতেই মরলও শেষে—অবশ্য তার সোর্স হার্ট কি না কে বলবে!—কণ্ঠ-প্রদাহ রোগে আমিও ভুগছি ঢাকা থেকে এসে অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে—আর মনে হচ্ছে আমিই যেন কীট্‌স্‌। সে কোন্‌ ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়তো বা আমারও বুকের চাপ-ধরা রক্ত তেমনি ক'রে কোনোদিন শেষ ঝলক উঠে আমায় বিয়ের বরের মত ক'রে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর হয়তো বা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা কত কবিতা বেরুবে হয়তো আমার নামে! দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, বীর,

বিদ্রোহী—বিশেষণের পর বিশেষণ! টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্‌পড় মেরে—বক্তার পর বক্তা।

এই অসুন্দর শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রাদ্ধ-দিনে—বন্ধু! তুমি যেন যেয়ো না। যদি পার চুপটি ক'রে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোনো একটি কথা স্মরণ ক'রো। তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশেপাশে যদি একটি ঝরা, পায়ে পেশা ফুল পাও, সেইটিকে বুকে চেপে ব'লো—"বন্ধু, আমি তোমায় পেয়েছি!"

আকাশের সবচেয়ে দূরের যে তারাটির দীপ্তি চোখের জলকণার মত ঝিলমিল করবে—মনে ক'রো, সেই তারাটি আমি। আমার নামে তার নামকরণ ক'রো। কেমন?

মৃত্যুকে এত ক'রে মনে করি কেন, জানো? ওকে আজ আমার সবচেয়ে সুন্দর মনে হচ্ছে বলে। মনে হচ্ছে, জীবনে যে আমায় ফিরিয়ে দিলে, মরণে সে আমায় বরণ ক'রে নেবে।

সমস্ত বুকটা দিন-রাত ব্যথায় টন্‌টন্ করছে—মনে হচ্ছে, সমস্ত যেন ঐখানে এসে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ওর যদি মুক্তি হয়, বেঁচে যাবে। কিন্তু কী হবে কে জানে!

হয়তো দিব্যি বেঁচে থাক্‌ব—কিন্তু ঐ বেঁচে থাকাটা অসুন্দর বলেই ওকে যেন দু'হাত দিয়ে ঠেলছি। বেঁচে থাকলে হয়তো তাকে হারাব। তারই বুকে তিলে তিলে আমার মৃত্যু হবে।

কেবলই মনে হচ্ছে কোনো নবলোকের আহ্বান আমি শুনতে পেয়েছি! পৃথিবীর সুধা বিস্বাদ ঠেকছে যেন।···

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি কেবলি ভাবছি আর ভাবছি। কত কথা—কত কি, তার কি কুল-কিনারা আছে?

কত কথা জানতে ইচ্ছে করে! কিন্তু কি সে কত কথা তা' বলতে পারিনে। দু'দিন আগে পারতাম, আজ আর পারব না। হৃদয়ের প্রকাশ যেখানে লজ্জার কথা—হয়তো বা অবমাননাকরও,

সেখানে পর্যন্ত গিয়ে পহুঁচবে আমার কাঙাল-মনের এই করুণ যাচ্ঞা, এ ভাবতেও মনটা যেন মোচড় খেয়ে ওঠে!

আমার ব্যথার রক্তকে রঙীন রঙের খেলা বলে উপহাস যিনি করেন, তিনি হয়তো দেবতা—আমাদের ব্যথা-অশ্রুর বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি মাটির নজরুল হলেও সে-দেবতার কাছে অশ্রুর অঞ্জলি আর নিয়ে যাব না।

কবির কাব্যের প্রতি এত অশ্রদ্ধা যাঁর—তাঁকে শ্রদ্ধা আমি যতই করি না কেন—পুনরায় কাব্যের নৈবেদ্য দিয়ে তাঁকে খেলো করবার দুর্মতি যেন আমার কোনোদিন না জাগে।

ফুল ধূলায় ঝরে পড়ে, পায়ে পিষ্টও হয়, তাই বলেই কি ফুল এত অনাদরের? ভুল ক'রে সে ফুল যদি কারুর কবরীতেই খসে পড়ে এবং তিনি সেটাকে উপদ্রব বলে মনে করেন, তা' হলে ফুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তখনই কারুর পায়ের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করা।

পদ্ম তার আনন্দকে শতদলে বিকশিত ক'রে তোলে বলেই কি ওটা পদ্মের বাড়াবাড়ি? কবি তার আনন্দকে কথায়-ছন্দে-সুরে পরিপূর্ণ পদ্মের মত ক'রে ফুটিয়ে রাঙিয়ে তোলে বলেই কি তার নাম হবে খেলো? অকারণ উচ্ছ্বাস? সুন্দরের অবহেলা সইতে পারিনে বন্ধু, তাই এত জ্বালা।

তুমি আমার "শেষ চিঠি" দেখেছ, লিখেছ। "শেষ চিঠি" লিখে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছ। তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবো?

জল খুব তরল, সর্বদা টলটলায়মান,—কিন্তু যে দেশের ঋতুলক্ষ্মী অতিরিক্ত cold—সে দেশের জলও জমে বরফ হয়ে যায়—শুনেছ? অতিরিক্ত শৈত্যে জল জমে পাথর হয়, ফুল যায় ঝরে, পাতা যায় মরে, হৃদয় যায় শুকিয়ে…

ভিক্ষা যদি কেউ তোমার কাছে চাইতেই আসে অদৃষ্টের

বিড়ম্বনায়, তা' হলে তাকে ভিক্ষা না দাও, কুকুর লেলিয়ে দিও না যেন।...

আঘাত আর অপমান এ দুটোর প্রভেদ বুঝবার মত মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়তো আছে আমার। আঘাত করবার একটা সীমা আছে, যেটাকে অতিক্রম করলে—আঘাত অসুন্দর হয়ে ওঠে—আর তখনই তার নাম হয় অবমাননা। গুণীও বীণাকে আঘাত করেই বাজান, তাঁর অঙ্গুলির আঘাতে বীণার কান্না হয়ে ওঠে সুর। সেই বীণাকেই হয়তো আর একজন আঘাত করতে যেয়ে ফেলে ভেঙে!

মন্থনের একটা ষ্টেজ আসে—যাতে ক'রে সুধা ওঠে। সেখানেই থামতে হয়। তার পরেও মন্থন চালালে ওঠে বিষ।

যে দেবতাকে পূজা করব—তিনি পাষাণ হন তা' সওয়া যায়, কিন্তু তিনি যেখানে আমার পূজার অর্ঘ্য উপদ্রব বলে পায়ে ঠেলেন, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায় বলতে পার?

আমার আহত অভিমানের দুঃখে তুমি ব্যথা পেয়ে কী করবে বন্ধু? সত্যিই আমি হয়তো অতিরিক্ত অভিমানী। কিন্তু তার তো ওষুধ নেই। বীণার তারের মত নার্ভগুলো সুরে বাঁধা বলেই হয়তো একটু আঘাতে এমন ঝনঝন্ ক'রে ওঠে।—ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি! যে স্নেহে যে প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়—তা' কখনো কোথাও পাইনি। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! ও নিয়ে আমি ধুয়ে খাব? তাই হয়তো অল্পেই অভিমান হয়। বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে দেখা দেবার আগেই তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আটকিয়েছি। এক গুণ দুঃখ হলে দশ গুণ হেসে তার শোধ নিয়েছি। সমাজ রাষ্ট্র মানুষ—সকলের ওপর বিদ্রোহ করেই তো জীবন কাটল?

এবার চিঠির উত্তর দিতে বড্ডো দেরী হয়ে গেল। না জানি কত উদ্বিগ্ন হয়েছ। কী করি বন্ধু, শরীরটা এত বেশী বেয়াড়া আর হয়নি কখখনো। ওষুধ খেতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন যেন "মরিয়া হইয়া" উঠছি ক্রমেই। বুকের ভিতর কী যেন অভিমান

অসহায় বেদনায় ফেনায়িত হয়ে উঠছে। রোজ তাই কেবলি গান গাচ্ছি। ডাকের অভাব নেই। রোজ অন্ততঃ দশ জায়গা হতে ডাক আসে। কেবলি মনে হচ্ছে আমার কথার পালা শেষ হয়েছে; এবার শুধু সুরে সুরে গানে গানে প্রাণের আলাপন।...

কাল একটি মহিলা বলছিলেন, "এবার আপনায় বড্ডো নতুন দেখাচ্ছে—যেন পাথর হয়ে গেছেন! সে হাসি নেই। সে কথার খই ফুটছে কই মুখে? বেশ ভাবুক ভাবুক দেখাচ্ছে কিন্তু!"...

আচ্ছা ভাই মোতিহার, বলতে পারিস্—তোর ফিজিক্স্ শাস্ত্রে আছে কি না জানিনে—আকাশের গ্রহতারার সাথে মানুষের কোনো relation আছে কি না। সত্যিই তারায় তারায় বিরহীরা তাদের প্রিয়ের আশায় অপেক্ষা করে?

আমায় সবচেয়ে অবাক করে নিশীথ রাতের তারা। তার শব্দহীন উদয়াস্ত ছেলেবেলা থেকে দেখি আর ভাবি। তুমি হয়তো অবাক হবে, আমি আকাশের প্রায় সব তারাগুলিকে চিনি। তাদের সত্যিকার নাম জানিনে, কিন্তু ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছি আমার ইচ্ছামত। সে কত রকম মিষ্টি মিষ্টি নাম, শুনলে তুমি হাসবে। কোন্ তারা কোন্ ঋতুতে কোন্ দিকে উদয় হয়, সব বলে দিতে পারি। জেলের ভিতর যখন সলিটারি-সেলে বদ্ধ ছিলাম—তখন গরমে ঘুম হতো না। সারারাত জেগে কেবল তারার উদয়াস্ত দেখতাম—তাদের গতিপথে আমার চোখের জল বুলিয়ে দিয়ে বলতাম—"বন্ধু! ওগো আমার নাম-না-জানা বন্ধু! আমার এই চোখের জলে পিচ্ছিল পথটি ধরে তুমি চলে যাও অস্তপারের পানে, আমি শুধু চুপটি ক'রে দেখি!" হাতে থাকত হাতকড়া—দেওয়ালের সঙ্গে বাঁধা, চোখের জলের রেখা আঁকা থাকত বুকে মুখে—বালুচরে ক্ষীণ ঝর্নাধারার চলে যাওয়ার রেখা যেমন ক'রে লেখা থাকে।

আজও লিখছি—বন্ধুর ছাদে বসে। সব্বাই ঘুমিয়ে। তুমি ঘুমুচ্ছ প্রিয়ার বাহুবন্ধনে। আরো কেউ হয়তো ঘুমুচ্ছে—একা—শূন্য

ঘরে কে যেন সে আমার দূরের বন্ধু—তার সুন্দর মুখে নিবু নিবু প্রদীপের ম্লান রেখা পড়ে তাকে আরো করুণ করে তুলেছে—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তার হৃদয়ের ওঠা-পড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি—তার বাম পাশের বাতায়ন দিয়ে একটি তারা হয়তো চেয়ে আছে—গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম-জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে—"ওগো সুন্দর! জাগো! জাগো! জাগো!"

আচ্ছা বন্ধু, ক'ফোঁটা রক্ত দিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল হয়—তোমাদের বিজ্ঞানে বলতে পারে? এখন কেবলি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—যার উত্তর নেই, মীমাংসা নেই, সেই সব জিজ্ঞাসা।

যেদিন আমি ঐ দূর তারার দেশে চলে যাব—সেদিন তাকে ব'লো এই চিঠি দেখিয়ে—সে যেন দু'টি ফোঁটা অশ্রু অর্পণ করে দেয় শুধু আমার নামে! হয়তো আমি সেদিন খুশীতে উল্কা ফুল হয়ে তার নোটন-খোঁপায় ঝরে পড়ব।

তাকে ব'লো বন্ধু, তার কাছে আমার আর চাওয়ার কিছু নেই। আমি পেয়েছি—তাকে পেয়েছি—আমার বুকের রক্তে, চোখের জলে। বড্ডো ঝড় উঠেছিল মনে, তাই দুটো ঝাপটা লেগেছে তার চোখে মুখে। আহা! সুন্দর সে, সে সইতে পারবে কেন এ নিষ্ঠুরতা? সে লতার আগায় ফুল, সে কি ঝড়ের দোলা সইতে পারে? দখিনের গজল-গাওয়া মলয় হাওয়া পশ্চিমের প্রভঞ্জনে পরিণত হবে—সে কি তা জান্‌ত? ফুলবনে কি ঝড় উঠতে আছে?

বলো বন্ধু, আমার সকল হৃদয় মন তারি স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমার চোখে মুখে তারই জ্যোতি—সুন্দরের জ্যোতি—ফুটে উঠেছে। পবিত্র শান্ত মাধুরীতে আমার বুক কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে—দোল্‌পূর্ণিমার রাতে বুড়িগঙ্গায় যেমন ক'রে জোয়ার এসেছিল তেমনি ক'রে। আমি তার উদ্দেশে আমার শান্ত স্নিগ্ধ অন্তরের পরিপূর্ণ চিত্তের একটি সশ্রদ্ধ নমস্কার রেখে গেলাম। আমি

যেন শুনতে পাই, সে আমায় সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে। আমার সকল দীনতা, সকল অত্যাচার ভুলে, আমাকে আমারো ঊর্ধ্বে সে দেখতে পেয়েছে—যেন জানতে পাই। ভুলের কাঁটা ভুলে গিয়ে তাঁর ঊর্ধ্বে ফুলের কথাই যেন সে মনে রাখে।

সত্যিই তো তার—আমার সুন্দরের—চরণ ছোঁয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার যে দু'হাত মাখা কালি। ব'লো, যে কালি তার রাঙা পায়ে লেগেছিল, চোখের জলে তা ধুয়ে দিয়েছি।

আর—অগ্রদূত! বন্ধু! তোমায়ও আমি নমস্কার—নমস্কার করি। তুমি আমার তারালোকের ছায়াপথ। তোমার বুকেই পা ফেলে আমি আমার সুন্দরের ধ্রুব-লোকে ফিরে এসেছি। তুমি সত্যই সেতু, আমার স্বর্গে ওঠার সেতু।

ভয় নেই বন্ধু, তুমি কেন এ ভয় করেছ যে, আমি তার নারীত্বের অবমাননা করব। কিন্তু তুমি ভুলে গেছ যে—আমি সুন্দরের ঋত্বিক। আমি দেবতার বর পেলাম না বলে, অভিমান ক'রে দু'দিন কেঁদেছি বলেই কি তাঁর অবমাননা করব? মানুষ হলে হয়তো পারতাম। কিন্তু বলেছি তো বন্ধু যে, কবি মানুষের হয় ঊর্ধ্বে অথবা বহু নিম্নে। হয়তো নিম্নেই। তাই সে ঊর্ধ্বে স্বর্গের পানে তাকিয়ে কেবলি সুন্দরের স্তবগান করে।

আমি হয়তো নীচেই পড়ে থাকব; কিন্তু যাকে সৃষ্টি করব—সে স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে—আমার ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। তারপর আমার মুক্তি।

সে যদি আমার কোনো আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তা' হলে তাকে ব'লো—আমি তাকে প্রার্থনার অঞ্জলির মত এই করপুটে ধরে তুলে ধরতে—নিবেদন করতেই চেয়েছি—বুকে মালা ক'রে ধরতে চাইনি। দুর্বলতা এসেছিল, তাকে কাটিয়ে উঠেছি। সে আমার হাতের অঞ্জলি, button hole-এর ফুল-বিলাস নয়।...

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে আবার

লিখছি। কিন্তু আর লিখতে পারছিনে ভাই। চোখের জল কলমের কালি দুই শুকিয়ে গেল।

তোমরা কেমন আছ জানিয়ো। তার কিছু খবর দাও না, কেন? না, সেইটুকুও নিষেধ করেছে? সময়মত ওষুধ খায় তো?

কেবলি কীট্‌স্‌কে স্বপ্ন দেখছি—তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যানি ব্রাউন। পাথরের মত। ভালোবাসা নিও। ইতি—

তোমার—

নজরুল।

॥ ৩৭ ॥

[আবদুল কাদিরকে লিখিত]

৮।১ পান বাগান লেন

ইণ্টালী, কলিকাতা।

২. ১. ২৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমায় চিঠি লিখছি দেখে তোমার চেয়ে বিস্মিত আমিই বেশী হচ্ছি। চিঠি না লেখাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে, কাজেই ওটাকে যখন দায়ে পড়ে হস্তস্থ করতে হয়, তখন হাতের চেয়ে মনটাই বেশী বিব্রত হয়ে পড়ে।

আমি চিঠি-পত্তর দিইনে বলে তোমাদের অভিমান যদি কখনো হয়, তা' হলে অন্ততঃ এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা লাভ ক'রো যে, আমার চিঠি পায় বলে কেউ আমার সুনাম ঘোষণা করেনি কোনোদিন! রবিবাবু চিঠি পেয়েই তার উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্তবড় কবি। আমি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপ্‌ল্‌ রক্ষা করি। আমি মুসাফির কবি। ভদ্রতা, সৌজন্য, স্নেহ, প্রীতির খাতির কোনোদিনই করি নি। এই যা সান্ত্বনা। রবিবাবুকে চিঠি দিয়ে লোকে ভাবে, উত্তর এল বলে।

আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর অশোয়াস্তির আশঙ্কা নেই ; সেই দাঁব্য নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির উত্তর কোনোদিনই পাবে না।

ব্যবসাদারীর কথাটা আগে বলে নিই, তারপর কবির অকাজের কথা হবে।

এতদিন আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়ে এসেছে আমার বোধোদয় হয়েছে, তাতেই মনে করেছি—এবার তার শোধ নেবো। এবার থেকে বইগুলো নিজেই প্রকাশ করব। 'চক্রবাক' নাম দিয়ে আমার একখানা কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছি। তারই বিজ্ঞাপন পাঠালাম পাঁচখানা তোমার কাছে। তুমি (১) "জাগরণে", (২) "সঞ্চয়ে", (৩) "আলফারুকে", (৪) "আমানে" ও (৫) "আজাদে" গিয়ে দিয়ে এস। যেন তাঁরা তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেন। আমি আমার সাধ্যমত তাঁদের কবিতা দিয়ে সাহায্য করব—যদি তাঁরা সাহায্য করেন। ঐ কাগজের সম্পাদকদের আলাদা আলাদা চিঠি দিতে পারলাম না সময়ের ও ধৈর্যের অভাবে। তোমার মারফতেই আমার অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পাদক সাহেবানদের।

তুমি তো ফেল করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ জসীমের সাথে, কাজেই এই হাঁটাহাঁটি করিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। আশা করি, এবারও পাশ না করার জন্য তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছ না।

ডিগ্রী যদি নাই পাও, অন্ততঃ তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। ডিগ্রীটা থাকে শেষের দিকে, অর্থাৎ ওটা ন্যাজের সামিল। আর ও-জিনিসটা অর্জন করার জন্য গর্ব আর যাঁরাই করুন আমি পাইনি বলে বিধাতাকে তার জন্য ধন্যবাদ দিই। ন্যাজ নিয়ে গর্ব করবার মতো বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি ; আমি নির্লাঙ্গুল।

তোমার কাব্য-সাধনা তোমায় যে ডিগ্রী দান করেছে বা

দেবে, তা হবে তোমার মাথার অলঙ্কার—শিরোপা। ঐটাই তোমার সত্যিকার গর্ব করবার জিনিস।

তুমি আর জসীম যেন একই নদীর জোয়ার-ভাটা, একই স্রোতের রকম-ফের।

একটু উপদেশের ঢিল ছুঁড়ব? তুমি আজকের মানুষকে খুশী করতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন ক'রো না যেন! ঐ রোগে আমার যে সর্বনাশ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবে না। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে বসে কনসার্টই বাজিয়েছি হাতের বাঁশী ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বৈ কমেনি। আজ সেই ব্যথার কথাই যখন সুরের সূতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা পড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে। আমার বেদনা-লোক তীর্থলোকে পরিণত হয়েছে। সরব হাততালির লোভের চেয়ে নীরব চোখের জলের অর্ঘ্য তোমার কাম্য হোক্—এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই। তোমাদের দেখে কত আশাই না পোষণ করি! মনে হয়, আমার গান থামলেও গানের পাখীর অভাব হবে না এই নতুন বুলবুলিস্তানে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের সঙ্গে আলাপ হলো—অনেক কথা। তার মনটাই বড় রত্ন। আর্শির মতো স্বচ্ছ। আর আর খবর দিও। ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম।

P. S. কংগ্রেসে আসনি, ভালোই করেছ। কংগ্রেস চৌত্রিশ ঘোড়ার রাজাকে এনে পেয়েছে চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম! দেখা যাক, স্বরাজের কেমন বাচ্চা বেরোয়!

॥ ৩৮ ॥

[বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত]

8/1 Pan Bagan Lane
Calcutta
4. 2. 29

চিরআয়ুষ্মতীসু !

ভাই নাহার ! কাল ঠাকুরগাঁও (দিনাজপুর) থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। পেয়ে যেমন খুশী হলাম, তেমনি একটু অবাকও হলাম। খুশী হলাম তার কারণ, আমি তোমায় চিঠি দিইনি এসে, দিয়েছি বাহারকে। অসম্ভাবিতের দেখা সকলের মনেই একটু দোলা দেয় বই-কি ! অবাক হলাম, আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজের কোনো কোনো বিবাহিতা মেয়ে একজন অনাত্মীয়কে (আমি রক্তের সম্পর্কের কথা বলছি ভাই, রেগো না যেন এ কথাটাতে !) চিঠি লিখতে সাহস করে না, তা' সে যত সহজ চিঠিই হোক। তা' ছাড়া, তুমি স্বভাবতঃই একটু অতিরিক্ত SHY বা Timid.

সত্যি বলতে কি, তোমার চিঠি পেয়ে বড্ডো বেশী আনন্দিত হয়েছি।

সলিম কি ফিরেছে ? ওরা অর্থাৎ বাহার, সলিম কখন আসবে কলকাতায় ?

সাতই তারিখে চিঠি দিয়েছ এবং লিখেছ, 'কালই কবিতাগুলো পাঠাব'। আজ চৌদ্দ তারিখ। আমার মনে হয় তোমার 'কাল' হয়তো কোনো অনাগত দিনকে লক্ষ্য ক'রে লিখিত হয়েছিল, যার কোনো বাঁধা-ধরা তারিখ নেই !

আমি জানি তোমার শরীর কি রকম ভেঙে গেছে, এর ওপর যদি ওসব র‍্যাবিশের তোমাকেই নকল-নবীশ হতে হয় তা'

হলে আমার দুঃখের আর অবধি থাকবে না। একটু পড়তেই তোমার মাথা ধরে, আর লিখতে গেলে মাথা হাত-পা সবগুলো হয়তো conspiracy ক'রে ধরবে। আমার অগতির গতি মেতু মিয়া তো আছেন। তাঁকে দিয়েই না হয় কপি করিয়ে পাঠিয়ে দাও। নইলে ফাল্গুনের কাগজে দেওয়া যাবে না।

কপি প্রেসে দিতে পারছি না লেখাগুলোর জন্য। বাহারকে আর বলব না। আশা করি তোমায় এ-ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব। তুমি একটু আদেশ দিয়ে মেতু মিয়া, হুক্কা মিয়া এণ্ড কোম্পানীকে দিয়ে এটা করিয়ে নিও।

দুপুরটা তোমার বাচ্চা-ই-সাক্কাওর জন্য কেমন যেন উদাস উদাস ঠেকে। ঐ সময়টুকু এক মুহূর্তের জন্য সে আমায় সব ভুলিয়ে দিত! ওকে আদর জানিয়ো আমার।

নানী আম্মার কান্নার কাণায় ভাটির জলের দাগ পড়েছে হয়তো এতদিনে। ওঁকে ব'লো আবার জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করতে। আমার সাম্পানের সব গান আজও লেখা হয়নি। আমার খেয়াপারের শেষ গান হয়তো তিনি শুনে যাবেন।

কলকাতার ঘেরা-টোপে ঘেরা খাঁচায় বন্দী হয়ে নব ফাল্গুনের উৎসব দেখতে পাচ্ছিনে চোখ দিয়ে, কিন্তু মন দিয়ে অনুভব করছি। নীলা আকাশ তার মুখ-চোখ বোধহয় একটু অতিরিক্ত ধোওয়া-মোছা করছে, কেননা তার মুখে যখন তখন সাবানের ফেনা—সাদা মেঘ ফেঁপে উঠতে দেখছি। তার ফিরোজা উড়নী বনে বনে লুটিয়ে পড়ছে। মাধবীলতায় পুষ্পিত বেণী, উড়ন্ত ভ্রমরের সারিতে আঁখি-পল্লব, পায়ের কাছে দীঘিভরা পদ্ম। সমস্ত মন খুশীতে বেদনায় টলমল করছে।

রোজায় বোধহয় আর কোথাও যাচ্ছিনে। তবে বলতেও পারিনে ঠিক ক'রে।

আম্মা কখন নোয়াখালি যাচ্ছেন হবু-বউ দেখতে? ভালো

দিনখন দেখে পাঠিও। মহী খুব গলা সাধছে, না? অর্থাৎ আমি চলে এলেও আমার ভূত এখনও চড়াও ক'রে আছে?

আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলীর খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে 'গুবাক তরুর সারি'র খবর নিশ্চয় দিতে পারবে ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে, ওদের আঁখি-পল্লবে হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশী ক'রে শ্বাস ফেলে। মনের চক্ষে ওদের আমি দেখি আর কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। তোমাদের পাড়ার ফাল্গুনী কোকিলরা হয়তো ভোরে তেমনি কোলাহল ক'রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এতদিনে হয়তো আমের শাখাগুলি মুকুলে মুকুলে নুয়ে পড়েছে, গন্ধে তোমাদের আঙিনা ভারাতুর হয়ে উঠেছে। আমি যেন এখান থেকেই তার মদগন্ধ পাচ্ছি।

আমার বুক-ভরা স্নেহাশীস্ নাও! নানী আম্মা, আম্মা প্রভৃতিকে সালাম; অন্য সকলকে ভালোবাসা, শুভাশীস্ দিও। ইতি—

তোমার

'নূরুদা'।

॥ ৩৯ ॥

[আজিজুল হাকিমকে লিখিত]

১১ ওয়েলেসলি স্ট্রীট

কলিকাতা

৫. ১০. ২৯

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি ও কবিতা পেলাম। কবিতাটি 'সওগাতে' দিলাম।

আমি চিঠির উত্তর দিইনে কারোর, এ বদনামটা কায়েম হয়ে গেছে। সময়ের অভাব বলেই দিতে পারিনে। পলিটিক্স্,

কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভাদ্র-বধূ বহুদিন হলো ঘোমটা টেনে ঘরের কোণ নিয়েছে।

তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দেখছি 'মোহাম্মদী'তে। দু'একটা খুবই ভালো লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকেই তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা-লোক তোমার উজ্জ্বল গ্রহ হয়ে দেখা দেয়নি বলে অধৈর্য হয়ো না। ও দানা বাঁধতে একটু সময় লাগবে হয়তো।

তোমার সামনে আজো বিপুল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, অসীম শূন্য তোমার চারপাশে, তোমার স্বপ্নলোকের নীহারিকাপুঞ্জ আজো বাষ্পাতুর। এই ভালো, আমি হয়ে উঠার চেয়ে সম্ভাবনাকে বেশী ভালোবাসি।

আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশীদিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহপুঞ্জ, তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল ক'রে থাকার কোনো প্রয়োজন হবে না এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখার কামনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—তোমরা এস অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখী, তাদের গান শোনাও!

জসীম, কাদির প্রভৃতিকে আমি ভালোবাসি আমারও চেয়ে। আজ হতে তুমি তাদেরই একজন হলে যাদের আমি ভালোবাসি। সব সময় খবর যদি না-ই দিতে পারি, মনে রাখব। আমার আন্তরিক শুভাশীষ ও স্নেহ গ্রহণ ক'রো। ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম।

॥ ৪০ ॥

[মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহারকে লিখিত]

২০. ১২. ৩০

চির-স্নেহাস্পদেষু,

প্রিয় বাহার! তোমার কাছে "সাত ভাই চম্পা"র যে কবিতাগুলি ছিল—শ্রীমান কাদিরকে তা' দিও। জেলে গেলে দেখা ক'রো সেখানে গিয়ে। নাহার কোথায়? তার খোকা কেমন আছে? ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম।

॥ ৪১ ॥

[১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সম্পাদক জনাব এম্. সেরাজুল হককে লিখিত।]

কলিকাতা

৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৯

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আপনারা আমাকে অনাগতের আগমনী গাইতে আমন্ত্রণ করেছেন; আমি অযোগ্য, তবুও আহ্বান করেছেন। সেজন্য মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্ব জুড়ে আজ মহাজাগরণ। শিক্ষা ধর্মের নব নব স্ফুরণ। অভ্যুত্থানের বজ্রবিষাণ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বিশ্ব-ব্যাপী মহা-জাগরণের এই প্রদীপ্ত প্রভাতে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা কি মোহ-নিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে? ধর্ম-অধর্মের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহাসংঘর্ষের এই মহাসন্ধিক্ষণে তৌহিদের শান্তি-সাম্য-ঐক্য-মন্ত্রে সে কি ক্লান্ত-শ্রান্ত-ভ্রান্ত মানব-চিত্তের অবসন্নতা বিদূরিত

করবে না? জাতি ও কওমকে ধর্মপথে—সেরাতুল মুস্তাকীমে—পরিচালিত সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পাবে না? তরুণ বন্ধুরা কি মহা-কোরানের মহাবাণী "কুম্ বে-ইজ-নিল্লাহ"—ওঠো জাগো, এ বাণী ভুলে গিয়েছে? আমি তো দিব্য-চোখে দেখতে পাচ্ছি, ঐ স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়ায়ে আমাদের কীর্তিমান পূর্বপুরুষগণ আকুল প্রাণে আমাদের কর্মের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তরুণদের মন-মন্দিরে তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্বলিত হউক। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, সালাহউদ্দীন, খালিদ, তারিক, মুসা, হাঞ্জেলা, ওকবার সাধনা তাদের কর্মে রূপলাভ করুক। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরবশ্যতার প্রাচীন প্রাচীর চূর্ণ ক'রে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা জ্ঞান, চরিত্র, নীতি, সখ্য ও মনুষ্যত্বের পথে কাতারবন্দী হউক—এই আশা অন্তরে পোষণ ক'রেই আপনাদের নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। আপনাদের চেষ্টায় যুবকেরা নবজিন্দেগীর পথে অগ্রসর হোক—সকলের সাধনার জয়যাত্রা সাফল্য লাভ করুক, এই কামনা।

নজরুল ইসলাম।

॥ ৪২ ॥

[এম. সিরাজুল হককে লিখিত]

কলিকাতা
২ নভেম্বর, ১৯৩২

জনাব সম্পাদক সাহেব,

তস্‌লিম! আপনাদের নেতা আসাদ-উদ্দৌলা শিরাজীর মারফৎ আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাঙলা-দেশ আমার বিরুদ্ধে সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস!

'ধূমকেতু'র সারথীরূপে নয়—যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের

নিশান-বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদী অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া ও তা' হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্যপথ ধরে যাত্রা করুন। কোন বিঘ্নই সে-পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক! মুক্ত-প্রাণে মুক্ত-বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেই দিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জনকয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন, এজন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারদিকে বিপ্লব বিভীষিকা—অনাদর অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে—তবুও পিছপা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই! গায়ক আব্বাসউদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাল্লাহ্ ৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে পৌঁছব।

নজরুল ইসলাম।

॥ ৪৩ ॥

[নারায়ণগঞ্জ সঙ্গীত-সংসদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে লিখিত]

৩৯ সীতানাথ রোড
কলিকাতা
২৩. ৮. ৩৩

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান আজিজুল হাকিমের মারফৎ আপনাদের প্রস্তাবমত নিম্নলিখিত সর্তে আমরা ছয়জন আর্টিস্ট নারায়ণগঞ্জ যাইতে রাজী হইয়াছি।

প্রথম সর্ত :—আপনি আমাদিগকে ১২০০৲ টাকা (বার

শত টাকা) দিবেন। ঐ টাকায় আমরা নারায়ণগঞ্জে আগামী ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি গান করিব।

দ্বিতীয় সর্ত :—আপনারা আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ধেক টাকা অর্থাৎ ৬০০৲ (ছয় শত টাকা) অগ্রিম পাঠাইয়া দিবেন এবং বাকী ছয় শত টাকা (৬০০৲) প্রথম রাত্রি অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর গান হইয়া যাওয়ার পরেই পরিশোধ করিবেন। ঐ বাকী টাকা পাইলে তবে দ্বিতীয় রাত্রি আমরা গান করিবার জন্য বাধ্য থাকিব।

তৃতীয় সর্ত :—আপনি আমাদের যাওয়া আসার সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া দিবেন। পথে ও নারায়ণগঞ্জে খাওয়াদাওয়ার সমস্ত খরচ আপনাকে বহন করিতে হইবে।

চতুর্থ সর্ত :—নিম্নলিখিত ছয়জন আর্টিস্টের মধ্যে যদি কেহ অসুস্থ হইয়া যাইতে অসমর্থ হন, আমরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য আর্টিস্ট লইয়া যাইব—অবশ্য আপনাদের মত লইয়া।

পঞ্চম সর্ত :—আপনি যদি কোন কারণে, আমাদের সহিত চুক্তি করিয়া সে চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আমরাও চুক্তি ভঙ্গ করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব। ইহাই হইল মোটামুটি সর্ত। আপনার অন্য কোনো কিছু জানাইবার থাকিলে পত্র দিয়া জানাইবেন। আপনার সুবিধামত অন্য তারিখেও,—অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে—আমাদের যাইতে আপত্তি নাই।

আমরা নিম্নলিখিত ছয়জন আর্টিস্ট যাইব :—

১। অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, ২। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, ৩। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ৪। আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ৫। শ্রীরাসবিহারী শীল (সঙ্গতিয়া), ৬। কাজী নজরুল ইসলাম।

আপনার পত্র ও সম্মতি পাইলে আপনার লিখিত-মত চুক্তিপত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব। ইতি—

বিনীত

নজরুল ইসলাম।

॥ ৪৪ ॥

[মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে লিখিত]

৩৯ সীতানাথ রোড

কলিকাতা

৩. ৯. ৩৫

কল্যাণীয়াসু,

যে কোনোদিন সন্ধ্যা সাতটার পর আসতে পারেন। আমি সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর বাড়ীতেই থাকি। আসবার দিন খবর দিয়ে এলে ভাল হয়। ইতি—

শুভার্থী—

নজরুল ইসলাম।

॥ ৪৫ ॥

[কবি এই পত্রখানি তাঁর চাচা ডাঃ কাজী কায়েম হোসেন সাহেবকে ইংরেজিতে লিখেছিলেন। তা বাংলায় অনুবাদ করেছেন কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। মূল ইংরেজি চিঠিখানি এই সঙ্গে মুদ্রিত হলো।]

৩৯ সীতানাথ রোড

কলিকাতা

২৭. ৮. ৩৫

প্রিয় চাচাজী !

তসলিম ! এক যুগ পরে আপনাকে আমি চিঠি লিখছি। আমি আমার ভাইদের কাছ থেকে শুনলাম, আপনি তাদের উপর

যথেষ্ট দয়া এবং সহানুভূতি দেখিয়ে থাকেন। আমার নসীব খারাপ। আমি তাদের কোনো সাহায্য করতে পারি না, বরং তাদের যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি। আমার নিজেকেও (আর্থিক) সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমি আমার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি নতুবা আমি হয়তো সহজেই বেশ ধনীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারতাম।

ছোটবেলা থেকেই আমরা আপনার মহানুভব পরিবারের সাহায্য পেয়ে আসছি। আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে রয়েছে আপনার স্বর্গীয় করুণা ও মহানুভবতার স্বাক্ষর। নির্যাতিতদের প্রতি আপনার এই সহানুভূতির জন্যই আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন বিত্ত, খ্যাতি ও শান্তি! আমি জানি না, আপনার কদমবুসি করার জন্য কখন আল্লাহ্ আমাকে আমার গ্রামে যাওয়ার সুযোগ দেবেন।

আমি যেখানেই থাকি না কেন, গভীর শ্রদ্ধার সাথে আপনার কথা সব সময় স্মরণ করি।

আমার বড় ভাই কোনো এক রোগে ভুগছেন। কি রোগ, তা আপনিই ভালো বুঝতে পারবেন। আপনি কি মেহেরবানী ক'রে আপনার রোগী হিসেবে তাঁর সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন? আপনি সরাসরি অথবা আমার ভ্রাতার মাধ্যমে আপনার ওষুধ-পত্রাদির বিল পাঠিয়ে দেবেন। যদিও আমি একজন গরীব, তবু আপনার টাকা আমি অবিলম্বে পাঠিয়ে দেব। আশা করি, ওঁর জন্য যা কিছু করণীয় তা' আপনি করবেন।

আর একটি কথা—আমার ভাইয়ের কাছে শুনলাম, আমাদের গ্রামবাসী এবং জ্ঞাতিরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে। আমি আমার ভ্রাতাদের সাথে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আপনি মেহেরবানী ক'রে এঁদের উপর স্নেহদৃষ্টি

রাখবেন এবং এঁরা যাতে কারো দ্বারা কোনো কষ্ট না পায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

শুধু একজন বিচারক এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসেবেই নয়, আমাদের উপর চির-স্নেহশীল মুরুব্বী এবং আশ্রয়দাতা হিসেবেই আপনার কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। লাখ সালাম।

আপনার স্নেহভাজন—
নজরুল ইসলাম।

॥ ৪৬ ॥

[গ্রাম সম্পর্কে চাচা ডাঃ কাজী কায়েম হোসেনকে কবি এই চিঠিখানি লেখেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, এই চিঠিখানি ছাড়া আজ পর্যন্ত কবির কোন দ্বিতীয় ইংরাজী চিঠি পাওয়া যায় নি।]

39 Sitanath Road
Calcutta
27. 8. 35

My dear Uncle,

Taslim, It is after a "Yuga" that I venture to write to you. I have heard from by brothers of your kindness and help to them. Unfortunate as I am, I have not been able to help them in any way except that I have given them unnumberable troubles. I have acquired everything except wealth. So I am helpless to help even my ownself. I have sacrificed everything for my country or else I could be a rich man easily. From our childhood we have been care of your kind family, every drop of my blood flows your heavenly kindness and grace. It is only for this sympathy to the poor and oppressed that Allah has given you wealth, fame and peace. I do not

know when Allah will take to my native village to kiss the dust of your sacred feet, where ever I live I remember you with deepest regards. My elder brother is suffering from (some) sort of disease, which you are the best judge of. Would you be kind enough to take charge of him earnestly as one of your patients ? Please send the bill for medicine etc. direct or through my brother to me and I shall promptly pay the amount to you poor though I am. Hope, you will do the needful about him. Moreover I heard from my brother that some of my village brethren or rather relatives are against them and giving them much troubles. I, with my brothers, seek shelter under you. You will look after them and take necessary steps so that they are not be tortured by anybody. I appeal to you not only as Magistrate and President of Union Board but as our ever-kind patron and "Ashrayadata" with lakh salam.

Affectionarely yours,
Nazrul Islam.

॥ ৪৭ ॥

[জসীমউদ্দীনকে লিখিত]

Hinoo House
P O. Hinoo
Ranchi
13. 1. 36

সোদর প্রতিমেষু—

স্নেহের জসীম ! আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ নাও। আমি পরশু (বুধবার) মোটরে ক'রে কলকাতা যাচ্ছি—সাথে ছেলে-মেয়েরাও

যাবে। বিষ্যুৎবার সকাল বা বিকালে তোমার সাথে গিয়ে দেখা করব। গ্রামোফোন রিহার্স্যাল-রুমে তোমায় বলেছিলাম যে, এইবার আমি মক্তবের জন্য একখানা বই (মক্তব-সাহিত্য) পেশ করেছি approval-এর জন্য।

খোদা তোমার দিন দিন উন্নতি করুন এ আমি সর্বদা প্রার্থনা করি। তোমার যশঃখ্যাতি যে আমার কাছে কত বেশী গৌরবের তা' বোধহয় তুমি নিজেও জানো না। আমি সাহিত্যলোক হতে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি; কাজেই আমাদের সমাজের সমস্ত সুনাম যশঃগৌরব নির্ভর করছে তোমার কৃতিত্বের উপর। তুমি তাতে নিরাশ করবে না, এ বিশ্বাসও যথেষ্ট আছে আমার।

বইটা পড়ে দেখো গতানুগতিক পন্থাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে অভিনবত্ব দেবার চেষ্টা করেছি। এটা সত্যিই আমার লেখা ও সম্পাদনাও আমার—ওর কবিতাগুলো ও কয়েকটি গদ্য লেখা পড়লেই বুঝতে পারবে।

বিষ্যুৎবার কি গ্রামোফোন রিহার্স্যাল-রুমে আসবে, না আমি যাব তোমার কাছে? আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করবেন। ইতি—

নিত্য শুভার্থী

কবিদা।

॥ ৪৮ ॥

[১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় মুসলীম সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সঙ্গীত-বিভাগের অধিনায়কত্ব করার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে অনুরোধ করা হয়; তদুপলক্ষে কবি এই পত্রখানি লিখেছিলেন।]

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় মুসলীম সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আমাকে সঙ্গীত-জল্‌সার

অধিনায়কত্ব করার জন্য যে-আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি সানন্দ সম্মতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, এই উৎসবে রস-তৃষাতুর চিত্তের জন্য অমৃত ও আনন্দের "দৌড়" চলিবে, নব-যৌবনের উচ্ছল প্রাণ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইবে।

কাজী নজরুল ইসলাম।

॥ ৪৯ ॥

[কবি নজরুল ইস্‌লাম ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর আন্দাজ ১৩৪৭ সালের ৬ই পৌষ, শনিবার কলিকাতা মুসলীম ছাত্র-সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ক'রে এই বাণী প্রেরণ করেছিলেন।]

আমার আত্মার আত্মীয় প্রিয় মুসলীম ছত্রবৃন্দ,

আপনাদের সাদর দাওয়াতের 'মুজদা' বহন ক'রে এনেছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু আবুল মনসুর, মহীউদ্দিন ও নুরুল হুদা। আমি আপনাদের এ-দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তা'ছাড়া, ঢাকা থেকে ফিরে এসে শরীরও সুস্থ নয়। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী কাল আপনাদের প্রাণের-নওরোজে শরীক হব।

আমার মন্ত্র—"ইয়াকা না, বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন"। কেবল এক আল্লাহ্‌র আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি।—আমি ফকীর, আল্লাহ্‌র দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু, যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই—ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, শুধু ভারত কেন—সারা দুনিয়ায় সত্যের ডঙ্কা বেজে উঠবে—তৌহিদের—পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে। আমায় আপনারা ভাব-বিলাসী স্বপ্ন-চারী কবি মনে করতে পারেন—কিন্তু যুগে যুগে এই স্বপ্ন-চারীই ঊর্ধ্বতম জগৎ থেকে, আল্লার আর্শ, কুর্শী, লওহ্‌, কলম থেকে—শক্তি, সাহস, বাণী, অমৃত, শান্তি আনয়ন

করেছে। এই সত্যদ্রষ্টা স্বপ্নপথের পথিকরাই দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন-জর্জরিত মানবকে আনন্দের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন—ইমাম হয়ে—অগ্রপথিক হয়ে। আপনাদের মধ্যে যে মহা-শক্তি আজ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল আবেগে সকল বদ্ধ দুয়ার ভাঙতে চাচ্ছে, আমি নকীব হয়ে সেই শক্তিকেই আবাহন করেছি। ঐ শক্তিরই খাদেম হওয়ার জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি। কত হিটলার, কত কামাল আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছেন, তা' আপনারা জানেন না,—কিন্তু আল্লাহ্ আমায় তাঁদের স্বরূপ দেখিয়েছেন। সর্বশক্তিদাতা আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করুন—যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নব-যুগের সুবহ-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই প্রতীক্ষার শেষ মুহূর্ত আমরা কলরব করলেই শেষ হবে না। কৃষক বীজ বপন ক'রে জমিতে গাছ উদগত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, জমিতে লাঠি মেরে গাছ উদ্‌গত করবার চেষ্টা করে না। তবে আপনাদের এই উৎসব ও আগ্রহ যদি ঈদ-মোবারকের শুভ দিনের শেষ রাত্রির আনন্দ কলরব হয়—তবে তাকে আমি অভিনন্দিত করি—আমার সালাম জানাই।

আল্লাহ্ আপনাদের "সেরতুল-মুস্তাকিম্" সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করুন। যে অনাগত মোজাহেদীনের জন্য আল্লাহ্‌র ফেরদৌর-আ'লা আজও শূন্য রয়েছে—তার পবিত্র বক্ষ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্‌র আহ্বান নেমে আসুক আপনাদের অন্তরে—দেহে, আত্মায়। আল্লাহ্ আকবর।

আপনাদের ভাই—
নজরুল ইসলাম।

॥ ৫০ ॥

[বনগাঁ মহকুমায় তৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মীজানুর রহমানকে লিখিত।]

১৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৭. ২. ৪১

প্রিয় মিজান ভাই,

আপনার অপূর্ব পত্রখানা এর আগে পেয়েছি। পরেও পত্র পেয়েছি। উত্তর দিতে পারিনি ব'লে ক্ষুণ্ণ হবেন না। পত্র না দিলেও মনের পত্রাবগুণ্ঠনে আপনি ফুলের মত ফুটে আছেন। আমার পরম প্রেমময় প্রিয়তম আল্লাহ্ জানেন, কেন মাঝে মাঝে আপনাকে মনে প'ড়ে কান্না পায়। এ ফকীর এটুকু জানে যে, অনাগত বিপুল কর্মজগতে আপনার কাজ বিরাট। আল্লাহ্ আপনার অগোচরে তাই আপনাকে তাঁর আপন প্রিয় সখা ক'রে নিচ্ছেন। আল্লাহ্ যাঁর ছবি আমার অশ্রুর আর্শিতে প্রতিফলিত করেন, তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়তমদের মধ্যে একজন। তিনি নিত্য আল্লাহ্‌র রহমত পাচ্ছেন। আল্লাহ্‌কে প্রেমময় রূপে চিন্তা ক'রে তাঁর সান্নিধ্য ও প্রেম লাভ করুন।

রবিবার 'জাগরণে'র লেখা দেবো। আমার জন্য ভাববেন না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আপনি সব হয়ে যাবে। আমার অন্তরের ভালবাসা নিন। ইতি—

সখ্যধন্য
নজরুল।

॥ ৫১ ॥

[কবির বর্তমান রোগের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয় ১০. ৭. ৪২ ইং তারিখে। সে-সময় কবি বাস করতেন কলকাতায় ১৫।৪ নং

শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে। এই পত্রখানি সুফী জুলফিকার হায়দারকে লিখিত। পত্রে উল্লিখিত 'অমলেন্দু' হচ্ছেন অমলেন্দু দাসগুপ্ত; তিনি তখন দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন।]

১০. ৭. ৪২

প্রিয় হাইদর!

তুমি এখনই চলে এস। অমলেন্দুকে আজ পুলিশে arrest করেছে। আমি কাল থেকে অসুস্থ। ইতি—

নজরুল।

॥ ৫২ ॥

[কবি এই পত্রখানি আনুমানিক ১৫. ৭. ৪২ ইং তারিখে পরলোকগত ব্রজেন রায়চৌধুরীকে উদ্দেশ্য ক'রে লেখেন। সে-সময় ব্রজেনবাবু দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় সাব্-এডিটর পদে কাজ করছিলেন। পত্রে উল্লিখিত 'মনসুর' হচ্ছেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ; 'কালিপদ' হচ্ছেন শ্রীকালিপদ গুহরায়—সে-সময় 'নবযুগ' পত্রিকার এসিস্ট্যাণ্ট এডিটার; 'হেমদত্ত' হচ্ছেন শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত—সে-সময় 'নবযুগ' পত্রিকার অন্যতম সত্বাধিকারী। এই পত্রখানির ভাষা থেকে কবির তৎকালীন মানস-বিপর্যয় ও চিন্তা-বিকৃতি অনুমেয়।]

প্রিয় ব্রজেন,

কাল থেকে···সে···তুমি editorial লিখবে। আমি অক্টোবরের মধ্যেই ভালো হয়ে যাব। ফাল্গুন থেকে নব বসন্তের মত তেজ পাব। নৌজোয়ান হব, আমার "বন্ধু"র দেহ হয়ে যাবে, "বন্ধু" বলেছেন। তোমাদের বৌদি ভালো হয়ে যাবেন, বন্ধু বলেছেন। এঁরা এখন মাসে একশো টাকা ক'রে পাবেন। বন্ধু বলেছেন।···· ক'দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে, ও ক'দিন বিশ্রাম করুক। ফাল্গুন মাস থেকে তোমাদের মাইনে বেড়ে যাবে। ফাল্গুন মাস থেকে মনসুর আসবে—ওর মাইনে ৩০০৲ টাকা হয়ে যাবে। ও ফজলুল্

থেকে দু'মাস ধ'রে চীফ মিনিষ্টারের পা ধ'রে কেঁদেছে। ও ফাল্গুন আমারও পা ধ'রে কাঁদবে। ও আমায় যে ভালোবেসেছিল, সে ভালোবাসা সে স্ত্রীকে বাসেনি ছেলে-মেয়েকেও বাসেনি। ইতি—

নজরুল।

P. S. কালিপদ সকালে হেম দত্তকে দেখা করব। সে সব ব্যবস্থা করবে। তুমি এঁদের সাহায্য করো।

॥ ৫৩ ॥

[কবি এই পত্রখানি ১৭. ৭. ৪২ তারিখে তাঁর বন্ধু জুলফিকার হায়দারকে উদ্দেশ্য ক'রে লেখেন। পত্রখানির নীচে ইংরেজীতে Confidential & Personal লেখা ছিল।]

প্রিয় হায়দার,

খোকাকে পাঠালাম। তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এসো।

....আমি Blood pressure-এ শয্যাগত, অতি কষ্টে চিঠি লিখছি। আমার বাড়ীতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারদের তাগাদা প্রভৃতি Worries, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনি। তারপর নবযুগের Worries ৩।৪ মাস পর্যন্ত। এই সব কারণে আমার Nerves shattered হয়ে গেছে। ৭ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মত ৫।৬ ঘণ্টা ব'সে থেকে ফিরে এসেছি—। হিন্দু-মুসলিম Equity-র টাকা কারু বাবার সম্পত্তি নয়—বাংলার, বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা করতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য Sencerely appeal করেছ সত্যকার বন্ধু হয়ে। আমার হয়ত এই শেষ পত্র তোমাকে, একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু? কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতি কষ্টে দু'একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা হয় সর্ব শরীরে। হয়ত কবি ফিরদৌসীর মত ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব।

কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয়-স্বজনকে। হয়তো ভালই আছ।

তোমার

নজরুল।

17.7.42.

॥ ৫৪ ॥

[কৃষ্ণনগর থেকে এই চিঠিখানি কবি শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন। চিঠিতে উল্লেখিত মা ও মাসিমা হ'লেন শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মা শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দেবী ও মাসিমা হেমবরণী দেবী। হাবুল—শচীন কর। হামিদুল হক, সিরাজুল হক, বিজয় মোদক ও ডাঃ হৃদয় মোদক—এঁরা হ'লেন হুগলীর তৎকালীন বিপ্লবী দল।]

কৃষ্ণনগর

গ্রেস কটেজ

৯.১০.২৬

পরম কল্যাণীয় প্রাণতোষ !

আমি আজই খুলনা যশোর থেকে ফিরলাম। এসে শুনলাম তুই এর মধ্যে একদিন এসেছিলি। আজ সকালে আমাদের একটি খোকা হ'য়েছে। মা ও মাসিমাকে খবর দিস, তাঁরা যেন আশীর্বাদ করেন। হাবুল, হামিদ, বিজয়, হৃদয়, সিরাজ প্রভৃতিকেও জানাস।

তোর বৌদি ও মাসিমা ভাল আছেন। আমার শরীরটা খুব ভাল নেই। এর মধ্যে একদিন আসিস। অনেক কথা আছে। স্নেহাশীষ নিবি ও শান্তিকে দিস। ইতি—

শুভার্থী

কাজীদা।

॥ ৫৫ ॥

[শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

গ্রেস কটেজ

কৃষ্ণনগর

৮.৩.২৭

স্নেহের প্রাণতোষ!

আগামী রবিবার রাত্তিরে খোকার মুখে ভাত উপলক্ষ্যে কলকাতার ও স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করছি। তুই না এলে, হৈ হৈ আনন্দ করবে কে? তুই দু'দিন আগে যাতে আসতে পারিস সে চেষ্টা করিস। তোকে আসতেই হবে। আসবার সময় হাবুল ও শান্তিকে পারিস তো সঙ্গে নিয়ে এলে আমরা খুব খুশী হব। আশীর্বাদ জানিস। মাকে প্রণাম দিস। ইতি—

আশীর্বাদক

নজরুল।

॥ ৫৬ ॥

[চিঠিখানি চুঁচুড়ার কবি শ্রীসুবোধ রায়কে লিখিত। চিঠিতে যে নবজাতকের কথা উল্লেখিত হ'য়েছে ইনি হ'লেন কবির দ্বিতীয় সন্তান বুলবুল।]

কৃষ্ণনগর

৯.১০.২৬

প্রিয় সুবোধ,

তুই বোধ হয় এতদিন ফিরে এসেছিস তমলুক হ'তে। আমিও আজ ফিরলাম যশোর খুলনা প্রভৃতি ঘুরে। আজ সকালে আমাদের একটা খোকা হ'য়েছে। এবার বেশ মোটা তাজা হ'য়েছে খোকা। শ্রীমতীও ভাল। বাবা ও মাকে আশীর্বাদ করতে

বলিস। তুই কী একেবারে লেখা ছেড়ে দিলি নাকি? এবার না লিখলে কিন্তু মার খাবি। আমার ভালবাসা নে। ইতি—

তোর

কাজী।

॥ ৫৭ ॥

[এই চিঠিখানি আত্মশক্তির সম্পাদক শ্রীগোপাললাল সান্যাল মহাশয়কে লিখিত। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পুস্তক পরিচয়ে 'তারারা' ছদ্মনামে শ্রীতারানাথ রায় সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। এই সমালোচনায় কবির প্রতিও কিছু কটাক্ষপাত করা হয়। তার উত্তরে কবি এই সুদীর্ঘ পত্রটি লেখেন। এই চিঠিতে কবি জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পর্কে যে সকল কথা বলেছেন তা' উভয়ের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কের একটি মূল্যবান দলিল।]

শ্রীযুক্ত "আত্মশক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আপনার ২০শে আগস্টের আত্মশক্তির "পুস্তক পরিচয়"-এ নতুন সাপ্তাহিক "গণবাণী"র যে পরিচয় দিয়েছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। কারণ, 'গণবাণী'র সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট। অবশ্য "গণবাণী" পুস্তক নয়, 'আত্মশক্তি'র পুস্তক পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে পরিচিত হলেও; যেমন, আত্মশক্তি আপনার কাগজ হলেও ঐ সমালোচনাটা আপনার নয়।

ঐ "পরিচয়" নিয়ে বলবারটুকু আমারই ব্যক্তিগত, আমাদের কৃষক-শ্রমিক দলের নয়।

আশা করি, আপনার ঢাউস কাগজের একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবেন আমার বক্তব্যটুকু জানাতে।

এ অনুরোধ করলাম এ সাহসে যে, আপনার সম্পাদিত

পত্রিকাটি "শুক্রবারের আত্মশক্তি"; "শনিবারের পত্র" নয়। হঠাৎ এ কথাটা বলার হেতু আছে। কেউ কেউ বলছিলেন, 'শনিবারের চিঠি' নাকি একীভূত হয়ে উঠেছে আত্মশক্তির সাথে। অবশ্য, আমার এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি, যদিও দু'তিনবারে আমার এইরূপ ভুল ধারণা করিয়ে দিয়েছেন আর কি! এ রকম ধারণার আরও কারণ আছে। হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লাম ইটালির মুসোলিনী আর আফ্রিকার হাব্‌সি রাজার ইয়ার্কি চলতে চলতে শেষে কি এক রকম সম্বন্ধে পাকতে চলেছে। সেই ইয়ার্কিটা গুজব যে, হাব্‌সি দেশটা ইটালির সাথে একীভূত (Incorporated) হয়ে যাচ্ছে! হবেও বা! অত সাদা vs অত কালোয়, অত শীত vs অত গ্রীষ্মে যদি আঁতাত হতে পারে, তবে শনিবারের পত্র ও শুক্রবারের পত্রিকাতেই বা বন্ধুত্ব হবে না কেন, একীভূত না হোক! আমরা আদার ব্যাপারী, অত সব জাহাজের খবর নেওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই। তবে জানেন কি, "খোশ খবরকা ঝুটা ভি আচ্ছা" বলে একটা প্রবাদ আছে অর্থাৎ ওটাকে উল্‌টিয়ে বললে ওর মানে হয়, "বুরা খবরকা সাচ্চা ভি না চা"......আপনার "অরসিক রায়" এবং প্রবাসীর অশোকবাবুতে যখন কথা কাটাকাটি চল্‌ছিল তখন ওটা ইয়ার্কির মত অত হাল্‌কা বোধ হয়নি, যা দেখে আমরা আশা করতে পারতাম যে, ওটা শীগ্‌গীরই একটা সম্বন্ধে পেকে উঠবে। ফরেন "পলিসি" আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখালেখির শীগ্‌গীরই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, কেন না অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাক, তাঁর ঘুষি লড়বার ক্ষমতা আছে!

চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। অশোকবাবুর লেখার কসরৎ দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু "বক্সিং" শিখলে যে শক্তিশালী লেখকও হওয়া যায়, এ সন্ধান তো আগে আমায় কেউ দেননি, তা' হলে আমি আমার লেখার কায়দাটা অশোকবাবুর কাছ থেকেই শিখতাম!

আর অশোকবাবু ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা আমায় লিখতে শেখাবার জন্য কিরূপ সমুৎসুক, তা' তাঁদের আমার উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয়ে ছাপা বিশেষ বিশেষ সংখ্যা শনিবারের চিঠিগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন! বাগ্‌দেবী যে আজকাল বাগ্দিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠ্যাঙ্গা বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন!

আপনাকে আমি চিনি, তাই আমার ভয় হচ্ছিল আপনার কাগজের ইদানীং লেখাগুলো দেখে, যে কোনদিন বা আপনারওনামের শেষে B. A. (cantab) দেখে ফেলি। চিঠি মাত্রেই প্রাইভেট, তবু তার ভাষা সহজ ভদ্রতা শ্লীলতাকে যে এত বেশী অতিক্রম করবে, এ কথা গতিবিদ রামানন্দবাবুর বাড়ী থেকে প্রকাশ না হলে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারতেন? ও রকম লেখা ঐ রকম oxen বা cantab B. A. ইউরোপ প্রত্যাগত অতি সভ্য ছাড়া বোধ হয় কেউ লিখতে তো পারেনই না, পড়তেও পারেন না। অশোক-বনের চেড়ীর মার সীতার প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল জানা নেই। কিন্তু সে মার সরস্বতীর ওপর পড়লে যে কিরূপ মারাত্মক হয়, তা বেশ বুঝছি। আমার ভয় হচ্ছে, কোনদিন বা শ্রীযুক্ত বলাই চাটুজ্জে লেখা শুরু করে দেন!

শিবের গীত গাইতে ধান ভেনে নিলাম দেখে (ধান ভানতে শিবের গীত নয়) আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হচ্ছেন কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর, চিঠিতে যে আবোল তাবোল বকবার অধিকার সকলেরই আছে, তা' শনিবারের চিঠি পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেন না তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হলে আবার গণেশ ঠাকুরকে ডাকতে হয়।

এটাকে মনে করে নিন, আসল গান গাইবার আগে একটু "তারারা" করে নেওয়া, যেমন আপনারা "তারারা" করেছেন "গণবাণী"র আলোচনা করতে গিয়ে।

শ্রীযুক্ত "তারারা" লিখেছেন, "লাঙ্গল উঠে গিয়ে এটা (অর্থাৎ গণবাণী) নামল", কিন্তু "গণবাণী"র কভারে লেখা আছে "এর সাথে "লাঙ্গল" একীভূত হয়েছে"। যেমন Forward-এর সাথে Indian Daily News প্রভৃতি একীভূত হয়েছে। অতএব আসলে "লাঙ্গল" উঠে গেল না, সে দিয়ে গেল "গণবাণী"র মধ্যে, এর কারণও দেখিয়েছেন ওর সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ।

"গণবাণী"র কভারের লেখাটুকু বোধ হয় শ্রীযুক্ত "তারারা"র চোখে পড়েনি। অবশ্য আমি এ ইচ্ছা করছি না যে, তাঁর চোখে "লাঙ্গল" পড়ুক! চোখে খড়কুটো পড়লেই যে রকম অবস্থা হয়ে ওঠে!

তিনি আরো লিখেছেন, "এ নামের দল (বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল) এদেশে কবে তৈরী হল, কারা করল, কোন্ ভাত-কাপড়ের সংস্থানহীন অনশন অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার, তা' সাধারণকে জানানো উচিত। কোন্ সাধারণ সভায় এর উদ্বোধন, সেটাও জানানো দরকার।" "শ্রীযুক্ত তারারা" "দরিয়া পারে"র খবর লেখেন, অনেক কাগজে অনেক রকম অনেক কিছু লেখেন, সুতরাং দরিয়ার এপারের দেশী খবরটাও তিনি রাখেন, এ বিশ্বাস করা অপরাধের নয় নিশ্চয়। কিন্তু না রাখাটা অপরাধের, অন্ততঃ তাঁর পক্ষে—যিনি রাজনীতি আলোচনা করেন, তিনি আপাততঃ আপনার কাগজে কৃষক-শ্রমিকের খবরাখবর করলেও আগে নিশ্চয় করতেন না। নৈলে তিনি ও-রকম প্রশ্ন করে নিজেকে লজ্জায় ফেলতেন না। "বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল" সম্বন্ধে দু'-একটা খবর দিচ্ছি ওঁকে, ওঁর ওগুলো জানা থাকলে কাজে লাগবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ৬-৭ই তারিখে কৃষ্ণনগরে "নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনী"র দ্বিতীয় অধিবেশন হয় যার সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ কনফারেন্সের বিবরণী বাঙলার ইংরাজী বাঙলা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল, 'লাঙ্গলে' তো বেরিয়েছিলই, অবশ্য, ধনিকদলের কাগজ 'ফরওয়ার্ড' সে বিবরণী

ছাপায় নি—শুধু সভার সংবাদটুকু কোনো নারীহরণের মামলার শেষে দেওয়া ছাড়া। এরপর 'আলবার্ট হল' প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের যতগুলো সভাসমিতি হয়েছে, তার কোন সংবাদই ছাপেনি 'ফরওয়ার্ড'! আমরা দিয়ে আসলেও না! সম্পাদকীয় এই ধর্ম ও সৌজন্যটুকু বাঙলার আর কোন কাগজ অতিক্রম করে নি! অবশ্য 'ফরওয়ার্ড' বিলেতের ও জগতের আর আর দেশের শ্রমিকদের কথা লেখে, সুতরাং ও কাগজে বাঙলার জঘন্য চাষা মজুরদের কথাও লিখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাতে আবার এ কৃষক-শ্রমিক দলটা তুলসীবাবু নলিনীবাবুর মত ধনিক নেতার দ্বারা গঠিত নয়! গঠন করলে কারা, না, যত সব বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের চাষা কুলি মজুর—ক্ষয়কেশো, হাড়-চামড়া বের-করা, আধ-নাংটা বেগুন-সেদ্ধর মত মুখ-ওয়ালা চাষা মজুর! আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রূপ, না আছে চাল না আছে চুলো! তাতে আবার বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামী সব! বোঝো ঠ্যালা।

যাক, ঐ প্রজা সম্মিলনের প্রস্তাবসমূহ নবম সংখ্যা 'লাঙ্গলে' বেরিয়েছিল! ঐ সম্মিলনের প্রথম প্রস্তাবই হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক দল গঠনের প্রস্তাব।

উহারই চতুর্থ প্রস্তাব হচ্ছে :—

"লাঙ্গল" পত্রিকাকে কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আপাততঃ গ্রহণ করা হউক।" প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।

তারপর "তারারা"র সঙ্গীন প্রশ্ন—"কোন কোন ভাত-কাপড়ের সংস্থানহীন অনশন, অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার!" উত্তরে "তারারা" মহাশয়কে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন দয়া করে একবার ৩৭, হ্যারিসন রোডের "গণবাণী" অফিসে পদধূলি দিয়ে যান! গেলে দেখতে পাবেন, বহু ভাগ্যের পদধূলি "গণবাণী" অফিসে স্তূপীকৃত হয়ে "গণবাণী"কেও ছাড়িয়ে উঠেছে। সে অফিসে মাদুরের

চেয়ে মেজেই বেশী, চেয়ার টেবিল তো নঞতৎপুরুষ সমাস! মানুষ-গুলির অধিকাংশই মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবশ্য খাবার বেলায় বহুব্রীহি! বাজ-পড়া মাথা-ন্যাড়া তালাগাছের মত সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, "গণবাণী"র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে। অবস্থা তো সব "ফকির ফোক্‌রা, হাঁড়িতে ভাত নেই শানকিতে ঠোক্‌রা!" আর শরীরের অবস্থাও তেমনি। যেন সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিবাদ! আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাংলায় তা' ভেবে পাইনে! ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর ক'টা দিন সে বাঁচবে জানি না। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফ্‌ফরই দিনের পর দিন অর্ধাশনে অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে। আমি জানি এই "গণবাণী" বের করতে তাকে দুটো দিন কাঠে কাঠ অনশনে কাটাতে হয়েছে। বুদ্ধি মিঞাও আজ লীডার আর মুজফ্‌ফর মরছে রক্ত বমন করে! অথচ মুজফ্‌ফরের মত সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে কোনো মুসলমান নেতা তো দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখি না। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে যদি কারুর মাথার ঠিক থাকে, তা' মুজফ্‌ফরের "লাঙ্গলে" ও "গণবাণী"র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট বড় মাঝারি সকল দেশপ্রেমিক মিলে যখন

"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে" প্রবাদটার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে পনর দিন বিনাশ্রমে জেল বাসের বিনিময়ে অন্তত: একশত টাকার "ভাত-কাপড়ের সংস্থান" করে নিলে, তখন যারা তাদের ত্যাগের মহিমাকে মলিন করলে না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে—তাদের অন্যতম হচ্ছে মুজফ্‌ফর। মুজফ্‌ফর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামী এবং বাঙলার সর্বপ্রথম মুসলমান ষ্টেট প্রিজনার! বাঙলার বাইরে নানান খোট্টাই জেলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চলে গেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তাকে হিমালয় পর্বতস্থিত আল্‌মোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ওজন তার মাত্র ৭৪ পাউণ্ড। সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সে অনশনে, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলেনি কোনদিনই মুখফুটে যে, সে দেশের জন্য কিছু করেছে। বলবেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই তো তার জন্য এত কান্না পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রদ্ধা। সেই নেতা যিনি আজ কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, এবং ব্যাঙ্কে যাঁর জমার অঙ্কের ডান দিকের শূন্যটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, যাঁকে কলকাতায় এনে তাঁর টাউন হলের অভিভাষণ লিখিয়ে দিয়ে কাগজে তাঁর নামে কীর্তন গেয়ে বড় করে তুল্‌ল মুজফ্‌ফর—সেই মুজফ্‌ফর তার অতি বড় দুর্দিনেও একটি পয়সা বা এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি ঐ লিডার সাহেবের কাছে! সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু অমরা করি।

যে 'মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা করল মুজফ্‌ফর, অথচ তার নিজের নাম চিরকাল গোপন রেখে গেলে, সেই মুসলমান সাহিত্য সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হল এবং তার নতুন "সভ্যগণ" মুজফ্‌ফর রাজলাঞ্ছিত বলে এবং তাঁদের অধিকাংশই রাজভৃত্য বলে যখন তার বন্দী বা মুক্ত হওয়ার জন্য নাম পর্যন্ত নিলে না—তার ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা, তখনও একটি কথা কয়ে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুজফ্‌ফর! ও যেন প্রদীপের তৈল, ওকে কেউ দেখলে না,

দেখলে শুধু সেই শিখাকে, যা জ্বলে প্রদীপের তৈলকে শোষণ করে। শুধু মুজাফ্‌ফর নয়, এ দলের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। হালিম, নলিনী সব সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। একজনের আপ্যাণ্ডিসাইটিশ, একজনের ক্যান্‌সার, একজনের ম্যালেরিয়া, একজনের আল্‌সার, একজনকে ধরেছে বাতে। আর হাড় হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই! যাকে বলে নরক গুলজার, বলতে হলে সব শ্রীচরণ মাঝি ভরসা। কোমরের নীচে টাকা জুটলো না কারুর, আর পেটের ভিতর সর্বদা যেন বোমা তৈরী হচ্ছে—ক্ষিদের চোটে এমন হুড়মুড় করে। দিন-রাত চুপসে আছে—বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলের ব্লাডারের মত। চায়ের কাপগুলো অধিকাংশ সময়েই দন্ত "ক্লাইবস্ট্রীট" করে পড়ে আছেন।

লেখকের তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান শীতলিত এবং লাইট উজলিত ড্রয়ার টেবিল ডেস্ক পরিশোভিত দারোয়ান দণ্ডায়িত, ত্রিতল অফিস-কক্ষ ত্যাগ করে একটু নীচে নেমে (লিফট দিয়ে) তাদের অফিসের মোটরে করে আমাদের "গণবাণী" অফিসের ও তার কর্ণধারদের দেখে যাবার নিমন্ত্রণ রইল। বুভুক্ষুগুলো অন্ততঃ তাঁর পয়সায় একটু চা খেয়ে নেবে। অবশ্য ওকেও এক কাপ দেবে।

আমি নিজে গিয়েই শ্রীযুক্ত "তারারা"কে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এদিকেও ভাঁড়ে ভবানী! কয়েক দিন কলকাতায় যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও যেতে পারছিনে, ট্রেন ভাড়ার অভাবে। বাড়ির হাঁড়িতে ইঁদুরে বক্সিং খেলছে, ডন খেলছে! ক্যাপিট্যালিস্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা, তারা বলে, 'হাত বুলোতে হয়, পায়ে বুলোও বাবা মাথায় নয়, তোমার হাত-খরচা মিলে যাবে, কিন্তু ও কর্মটা হবে না দাদা! এমন কি মুজাফ্‌ফরের মত শুঁটকী হয়ে মর-মর হলেও না! তারপর "গণবাণী"র লেখা নিয়ে "তারারা" বলেছেন—'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক'রা লেখাপড়ার সঙ্গে গোটাকয়েক মতবাদ শিখলে ওগুলো শিগগীর বুঝতে পারবেন!—তাঁর ইংগিতটা এবং রসিকতাটা দুইটাই

বুঝলাম না, বুঝলাম শুধু তাঁর জানাশোনা কতটুকু—অন্ততঃ সেই সম্বন্ধে, যে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করছেন! তিনি কি জানেন না যে, কোনো দেশের কোনো শ্রমিকই কার্ল মার্ক্সের "ক্যাপিট্যাল" পড়ে বুঝতে পারবে না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে, তারা কৃষক শ্রমিক নয়, তারা লেনিন ল্যান্সব্যারীর নমুনার লোক। কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। ঐ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরী করে তুলবে সেই রকম লোক যাঁরা বুঝাবেন ঐ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়ীতে চড়বে সর্বসাধারণ। "গণবাণী"ও কৃষক-শ্রমিকদের পড়ার জন্য নয়, কৃষক শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা—"গণবাণী" তাঁদেরই জন্য। "কৃষক শ্রমিক দলের মুখপাত্র" নামে তাঁদের বেদনাতুর হৃদয়ের মূক-মুখের বাণী এই "গণবাণী" তাদের বইতে-না-পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে "গণবাণী"। ইতি—

৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

বিনীত

নজরুল ইস্‌লাম।

আমরা লক্ষ্মী-ছাড়ার দল

এস ভাই, পথের সাথী বন্ধুরা আমার, এস আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল! আজ শনি এসেছে তোমাদের পোড়া-কপালে বাসি-ছাই-এর পাণ্ডুর টিকা পরিয়ে দিতে। এস আমার লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা ভাইরা! আজ ঝর-ঝর বারিধারায় সুরে সুরে কান্না উঠেছে—"হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা! এই আকাশ-ভাঙ্গা আকুল ধারার"

মাঝে নাঙ্গা শিরে আতুল গায়ে বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস পথের সাথীরা। তোমাদের জন্য গৃহ নাই, তোমাদের জন্য দায় নাই, করুণা নাই, এই দুর্দিনে তোমাদের ঘরে ডেকে নেবার কেউ নেই, তোমাদের ডাক দিয়েছে ঐ ঝড়-বাদলের উতল হাওয়া আর মাটির মায়ের সিক্ত কোল। তোমাদের জন্য কোনো গৃহের বাতায়নে কালো চোখের করুণ কামনা ঝিলিক মারে না, তোমাদের অভাবে ঐ দুর্দিনে কারুর মন্দিরে শূন্যতার ধ্বনি বাজে না, তোমাদের কারুর হৃদয় পীড়িত হয়ে ওঠে না। এস আমার অনাদৃত লাঞ্ছিত ভাইরা, আমরাই নতুন করে আমাদের জ্বালার জগৎ সৃষ্টি করব। শনি হবে আমাদের কপালে জয়টিকা, ধূমকেতু হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধূ। এস—এস আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল। ত্যক্ত শতমুখী আমাদের বিজয়কেতন, মড়ার মাথা আমাদের রক্ত দেউল-দ্বারে মঙ্গল-ঘট, গরল আমাদের তৃষ্ণার জল, দাবানল-শিখা আমাদের শান্তি-নিকেতন। এস আমার শনির শাপদৃপ্ত ভাইরা! আমরা জয়নাদ করব অমঙ্গল আর অভিশাপের, সদ্য পুত্রহীনা জননী আর স্বামীহারা সদ্য বিধবার সৃষ্টি-কাঁদানো ক্রন্দন আমাদের মাধবী-উৎসবের গান, মৃত্যু-কাতর মুখের যন্ত্রণা আমাদের হাসি, আর ঐ যে ঘরে ঘরে মায়ের মমতা, বোনের স্নেহ, প্রেয়সীর ভালবাসা ঐ আমাদের চোখের জল। ঐ যে গৃহের শান্তি, তৃপ্তি আনন্দ, ঐ আমাদের কান্না। ঐ তরুণ কালো চোখের দীপ্তি আমাদের শিকল, ঐ শূন্য হিয়ার ব্যথিত কামনা আমাদের কারাগার। ঐ শ্মশান-মশান-চারিণী চণ্ডী আমাদের বীণবাদিনী। মহামারী, মারীভয়, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা। এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু হবে। এস আমার সূর্যতাপস তরুণের দল। সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সান্ধ্য-প্রদীপ, মায়া-কান্না আর পেচক শিবাদি-রব আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি। মরীচিকা

আমাদের লক্ষ্য, আঘাত আমাদের আদর, মা'র আমাদের সোহাগ। সর্বনাশ আমাদের স্নেহ, বজ্র-মার আমার আলিঙ্গন। উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল, সাইক্লোন আমাদের প্রিয়ার এলোকেশ। সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার, অনন্ত নরক-কুণ্ড।

এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র-চুল্লির মধ্যে বসে তোমাদের নবসৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তোমাদের এই রুদ্র তপস্যার প্রভাবে সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, যেমন 'ইব্রাহীমের' পরশে 'নমরুদের' জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল। এস আমার অভিনব তরুণ তপস্বীর দল! তোমাদের আহ্বান করছি, এস।

তুবড়া বাঁশীর ডাক

ঐ শোন—

"পূব সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় শন্‌শন্
শাপ খেলাবার বাঁশী।"

বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস বিবর থেকে অগ্নি-বরণ নাগ-নাগিনী তোমার নিযুত ফণা দুলিয়ে। ঐ শোন্ সাপুড়ের তুবড়ী বাঁশীর ডাক "ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্"। এস আমার বিষধর কাল-কেউটের দল। তোমাদের বিবর ছেড়ে বেরিয়ে এস এই দিনের রৌদ্র সিন্ধু-কূলে। তটিনী-তীরের কেতকী কুসুমে কুসুমে জড়িয়ে আছে যারা, কেয়া-মূলের গোপন-তলে আত্মগোপন করে আছে যারা, সেই নাগ-নাগিনীদের মনসার পূজা-বেদী হতে আজ ডাক এসেছে। ঐ শোন তাঁর দূত বাজায় "ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় শন্ শন্"।

তোমাদের আদি মাতা অগ্নিনাগিনী আজ গগনতলে বেরিয়ে এসেছে, তার পুচ্ছে কোটি নাগ-শিশু খেলা করছে, ঐ শোনো তার ডাক ঘন ঘন শন্ শন্। ঐ শোন সাপুড়ের গভীর গুরুগুরু ডম্বরু রব। তারই রবে বিপুল উল্লাসে পুচ্ছ তুলে সাপটি উঠেছে দিকে দিকে নাগপুরে নাগ-নাগিনী, অধীর আবেগে বাসুকীর ফণা দুলে দুলে উঠছে— বিসুবিয়াসের বিপুল রন্ধ্র দিয়ে তার নাসার বিষ-ফুৎকার শুরু হয়েছে। বেরিয়ে এসো—বেরিয়ে এসো, বিবরের অন্ধকার হতে এই রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত দিবালোকে হে আমার বিষধর কাল-ফণীর দল। তোমাদের বিষ-দাঁতের ছোবলে-ছোবলে ধরণী জর্জরিত হয়ে উঠুক, তোমাদের অত্যুগ্র নিশ্বাসে নিশ্বাসে আকাশ তাম্র-বর্ণ হয়ে উঠুক, বাতাসে বাতাসে জ্বালাদগ্ধ অগ্নি-দাহন হু-হু-হু-হু করে ছুটে যাক, তোমাদের কর্কশ পুচ্ছে জড়িয়ে বসুমতীর টুঁটি টিপে ধর। তোমাদের বিষ-জরজর পুচ্ছকে চাবুক করে হানো—মারো এই মরা নিখিল-বাসীর বুকে মুখে। বিষের রক্ত-জ্বালায় তারা মোচড় খেয়ে খেয়ে একবার শেষ আর্তনাদ করে উঠুক। খসে খসে পড়ুক তাদের রক্ত-মাংস-অস্থি তোমাদের বিষ-তিক্ত চাবুকের আঘাতে আঘাতে। গর্জন কর, গর্জন কর আমার হলাহল-শিখ ভুজঙ্গ শিশুর দল। বিপুল রোষে তোমরা একবার ফণা তুলে তোমাদের পুচ্ছের উপর ভর করে দাঁড়াও, বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠুক শুধু তোমাদের নিযুত কাল-ফণা। আকাশে-বাতাসে দুলুক শুধু তোমাদের নাগ হিন্দোল। পাতালপুরের নিদ্রিত অগ্নি-সিন্ধুতে ফুঁ দাও—ফুঁ দাও—ফুঁ দিয়ে জ্বালাও তাকে। আসুক নিখিল অগ্নি-গিরির বিশ্ব-ধ্বংসী অগ্নিস্রাব, ভস্মস্তূপে পরিণত হোক এ-অরাজক বিশ্ব। ভগবান তার ভুল শোধরাক, এ খেয়ালের সৃষ্টিকে, অত্যাচারকে ধ্বংস করতে তোমাদের কোটি ফণা আস্ফালন করে ভগবানের সিংহাসন ঘিরে ফেলুক। জ্বালা দিয়ে জ্বালাও জ্বালাময় বিধি ও নিয়মকে।

এস আমার অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল! তোমাদের পলক-হারা

রক্ত-চাওয়ার যাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম করে ফেল, তোমাদের বিপুল নিশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আন ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহ্বরে। আকাশে ছড়াও হলাহল জ্বালা, নীল আকাশ পাংশু হয়ে উঠুক! রবি-শশী-তারা গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষদাহনে নিবিড় কাল হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবীর রঙে রেঙে উঠুক। বিদ্যুতে-বিদ্যুতে তোমাদের অগ্নি-জিহ্বা লক লক করে নেচে উঠুক। ঢালো তোমাদের সঞ্চিত বিষ ঐ মহাসিন্ধু, নদনদী বারি-রাশির মাঝে—টগবগ করে ফুটে উঠুক এই বিপুল জলরাশি—আর তার বুকে তোমাদের বিষ-বিন্দু বুদ্‌বুদ হয়ে ভেসে বেড়াক।

আজ 'ভাসান' উৎসবের দিন। মনসার পূজা-বেদীতে তোমাদের সঞ্চিত বিষ উদ্‌গিরণের আহ্বান এসেছে। এস—এই ধূমকেতু-পুচ্ছের অযুত অগ্নি-নাগ-নাগিনীর মাঝে কে কোথায় আছ কোন্ বিবরের অন্ধকারে লুকিয়ে হে আমার পরম প্রিয় বিষধর কালফণীর দল! এই অগ্নিনাগ-বাসে তোমাদেরও বিষ-চক্র-লাঞ্ছিত ফণা এসে মিলিত হোক, তোমাদের বিষ-নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ধূমকেতু-ধূম—আরো, আরো ধূমায়িত হয়ে উঠুক।

"ঐ শোনো—শোনো—
ঘন ঘন শন্ শন্
সাপ খেলাবার বাঁশী।"

মোরা সবাই স্বাধীন
মোরা সবাই রাজা

একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, "মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা!" দেখবে অমনি তোমার পূর্ব-পুরুষের রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মত টুটে পড়েছে, তোমার চোখের

সাত-পুরু-ক'রে বাঁধা পর্দা খুলে গেছে, তিমির রাত্রির দিক-চক্রবালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। তোমার হাতে-পায়ে গর্দানে বাঁধা শিকলে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে বল দেখি বীর—"মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা!" দেখবে অমনি তোমার সকল শিকল, সকল বাঁধন টুটে খান-খান হয়ে গেছে।

স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে, নিজেই রাজা বা সবাই রাজা; আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পুতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোনো ভয়কে পরোয়া না করে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে, নৈলে নয়।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই "আমার রাজা আমি"—বাণী বলবার সাহস আছে কোন্ বিদ্রোহীর? তার সোজা উত্তর—যে বীর কারুর অধীন নয়, বাইরে ভিতরে যে কারুর দাস নয়, সম্পূর্ণ উদার, মুক্ত! যার এমন কোনো গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে সে নিজের সত্যকে ফাঁকি দেয়, শুধু সেই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম্-জ্ঞান আত্মজ্ঞান—অহংকার নয়, এ হচ্ছে আপনার ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস। এই আত্ম-বিশ্বাস না থাকলে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়। ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। পরকে ভক্তি ক'রে বিশ্বাস ক'রে শিক্ষা হয় পরাবলম্বন, আর পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব। এই মনের পরাবলম্বন বা গোলামীই আমাদের চির গোলাম ক'রে রেখেছে। আমাদের তেত্রিশ কোটি লোকের তেত্রিশ কোটি দেবতা, অর্থাৎ আমাদের ভারতে তেত্রিশ কোটি মানুষের সকলেরই নির্ভরতা তাদের স্ব-স্ব দেবতার ওপর! সবাই বলেন, দেবতা আছেন—আর তাঁরা নেই! অর্থাৎ কিনা এটা নাস্তিকের দেশ, স্ব-হীন দেশ। অতএব এ স্ব-হীন দেশ যদি বলে যে, স্বরাজ লাভ করব, তাহলে যে তাদের উপহাস করে আর ঐ নাস্তিকের বুকে লাথি মারে, সে অন্যায় করে বলে তো মনে হয় না। উল্টে উপকারই করে। তার অন্তরে আপন সত্য আপন

ভগবান সহজে জাগে না, তাদের ভগবান এমনি করে বুকে লাথি খেয়ে তবে জাগে। যারা আমাদের পায়ের তলায় রেখে আমাদের বুকে পদাঘাত করছে, মুখে থুথু দিচ্ছে তারা আমাদের নমস্য।

সে অসুরের পায়ের ধূলো আমি মাথায় নিই, যে অসুর ভীরু দেবতাকে পদাঘাত ক'রে পৌরুষ শেখায়, তার লুপ্ত দেবত্বকে সিংহ বিক্রমে জাগিয়ে তোলে। যে জাগ্রত ওস্‌মান সুপ্ত জগৎ-সিংহকে ভীম-পদাঘাতে উদ্‌বুদ্ধ করে, তাকে আমি নমস্কার করি, যে ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগায়, সে ভৃগুকে আমি প্রণাম করি, যে নরমুণ্ড-মালিনী চণ্ডী নিদ্রিত শিবের বুকে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে প্রলয়-করতালি বাজিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলে, সেই অশিব-নাশিনীর উদ্দেশ্যে আমার কোটি কোটি নমস্কার। শিবকে জাগাও, কল্যাণকে জাগাও। আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত লাথি যদি মারতে পার, তা' হলে ভগবানও তা' বুকে করে রাখে। ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধূলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোন ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, আনো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা দুন্দুভি। বল, যে যায় যাক সে, আমি আছি। বল আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থর থর করে কেঁপে উঠুক! বল কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। যে অপমান করে তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সেই, যে অপমান সয়। তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে তবে বিশ্বে এতবড় দানব-শক্তি নেই তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে। নির্যাতন যদি সয়ে থাক, তবে সে দোষ তোমারি। নিজের দুর্বলতার জন্যে অন্যের শক্তির নিন্দা করো না।

জাগো অচেতন, জাগো! আত্মাকে চেন! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই

পতাকা তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে। তোমারি আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে উদার আকাশ-তলে এক পঙ্‌ক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বাগত

"খোশ-আমদেদ্।" স্বাগত হে দেশবন্ধু! হে বীরেন্দ্র! তোমাদের এই তিমির রাত্রির অবসানে আমরা আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তোমরা ফিরে এস এই বাঙলার শ্মশানে।

জ্বালিয়ে রেখেছি এই শ্মশান-চিতার হোমশিখা, এস ঋষি; হোতা হও, এস তবে, কপালে শ্মশান-ভস্মের পাংশু টিকা পরিয়ে দিই। দেখেছ, কি ভীষণ ধূমকুণ্ডলী উঠেছে বাঙলার আকাশ বাতাস ছেয়ে। বল ঋষি, "বাঙলার মাটি বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।" এস ঋত্বিক, উচ্চারণ কর শব-সাধনার মন্ত্র। এই শবের মাঝে শিব জাগাতে হবে। পারবে?—তবে এস। এই নাও মড়া, এই ধর নর-কঙ্কাল—স্তূপে স্তূপে সাজানো। আর কি চাও ঋষি? ঐ দেখ শৃগাল, ঐ দেখ কুক্কুর—ঐ দেখ শকুন—মড়ার পচা মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়ি করছিল। জ্যান্ত মানুষের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। ঐ দেখ শ্মশানে নাচছে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী,—এই ভূতেভরা শ্মশানে এসে তোমাদেরও যেন ভূতে না পায়, সাবধান ঋষি! তোমরা ছিলে অন্ধকারের শান্তিতে, স্নিগ্ধ কালো অন্ধকার তোমাদের মায়ের মত কোলে করে রেখেছিল। এখন এলে শ্মশানের বিকট অট্টহাস, করুণ আর্তনাদ আর প্রলয়-নৃত্যের ভীম কোলাহলের মাঝে।

ভয় পাচ্ছ কি ঋষি? সাবধান। এ কাল-শ্মশানে এসে সবাই ভয় পায়, ভূত-যোনি-গ্রস্ত হয়। তাই আবার বলি, সাবধান! এখানে বড় ভয়, বড় ক্রন্দন, বড় জ্বালা। সইতে পারবে? এখানে মায়ের

কোল নেই, পিতার মঙ্গলহস্ত নেই, ভগিনীর স্নেহ নেই, এখানে কল্যাণীর মঙ্গলদীপ জ্বলে না। কেউ পথ দেখাতে নেই। অভাব, বেদনা, আঘাত, মার, বিদ্রূপের চাবুক জ্বালা, অনাদর, অপমান—এই সপ্ত নরক হ্যাঁ করে আছে গ্রাস করবার জন্যে। এই জাহান্নামের মধ্যে বসে পুষ্পের হাসি হাসতে পারবে?—তবে এস ঋষি, এস। বন্ধন ভয় রাজভয় বিজেতা বীর তোমরা, এই শ্মশানে শবের মাঝে এসে ব'স। শিব আর অন্নপূর্ণাকে এই মড়ার মুল্লুকে যদি কোনদিন আনতে পার, তবে সেই দিন তোমাদের নমস্কার ক'রব। আজ তোমাদের জন্যে আমাদের নমস্কার নেই।

এই শ্মশানে আছে শুধু পিশাচের খলখল অট্টহাস, আর অসহায়ের করুণ নাড়ী-ছেঁড়া মর্মভেদী ক্রন্দন। তা' নিতে চাও? তবে নাও। কিন্তু তা' সইবে না ঋষি। আবার বলি, আজ তোমাদের জন্যে গৃহের মঙ্গল-শঙ্খ নয়,—তোমাদের জন্যে স্রক্ চন্দন নয়, তোমাদের জন্যে শ্মশানের ধূম আর ভস্ম, অট্টহাস আর ক্রন্দন, রক্ত আর অশ্রু-মৃত্যু আর ভীতি! এরই মাঝে হে চিত্তরঞ্জন, হে বীরেন্দ্র! তোমাদের জন্যে ধূলায় আসন পাতা। তোমরা এস। স্বাগত।*

"মেয় ভুখা হুঁ"

পাগলী মেয়ের কী খেয়াল উঠল, হঠাৎ দুপুর রাতে ডুকরে কেঁদে উঠল, "মেয় ভুখা হুঁ!"

মঙ্গল-ঘট গেল ভেঙে, পুরনারীর হাতের শাঁখ আর বাজে না, শাঁখাও গেল টুটে। ভীত শিশু মাকে জড়িয়ে ধরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে: "মা, ও কে কাঁদে?"

মা বললে, "চুপ কর্, ও পাগলী, ও ডুলুনি, ছেলে ধরতে এসেছে।"

* দেশবন্ধু ও বীরেন্দ্র শাসমলের কারামুক্তি উপলক্ষে।

পাশে ছিল দস্যি ছেলে ঘুমিয়ে। সে লাফিয়ে উঠে বললে, "মা, আমি দেখব পাগলীকে!"

মা ঠাস্ করে ছেলের গালে এক চড় কসিয়ে দিয়ে বললে, "দস্যি ছেলে! কথার ছিরি দেখ, ঐ ডাইনী মাগীকে দেখবেন? শুয়ে থাক্ গিয়ে চুপটি করে। ষাট! ষাট!"

কিন্তু ছেলে আর ঘুমোয় না। তার কাঁচা রক্তের পুলক-নাচা চঞ্চলতায় এক অভিনব সুর বাজতে লাগল!

"মেয় ভুখা হুঁ।"

সে সুর—সে ক্রন্দন কাছে—আরো—আরো কাছে এসে যেন তারই দোরের পাশ দিয়ে কেঁদে গেল অনেক দূরে পূবের পানে। সে ক্রন্দন যত দূরে যায়, দস্যি ছেলের রক্ত ততই ছায়ানটের নৃত্য হিন্দোলায় দুলতে থাকে, ভূমিকম্পের সময় সাগর-দোলানির মত। ছেলে দোর খুলে সেই ভুখারিণীর কাঁদন লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে ছুটল। মা বার-কতক ডেকে দোরে লুটিয়ে পড়ল। সে অসম্ভবকে দেখবে, সে ভয়কে জয় করবে।

এলোকেশে জীর্ণা শীর্ণা ক্ষুধাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে "মেয় ভুখা হুঁ!" তার এক চোখে অশ্রু আর এক চোখে অগ্নি। দ্বারে দ্বারে ভুখারিণী কর হানে আর বলে, "মেয় ভুখা হুঁ!"

বুড়োর দল নাক সিঁটকিয়ে ভাল ক'রে তাকিয়াটা আঁকড়ে ধরে, তরুণ যারা তারা চমকে বাইরে বেরিয়ে আসে, আর মা'রা ভয়ে বুকের মানিককে বুকে চেপে ধরে।

স্ত্রী ঘুমের মাঝে স্বামীর ভুজ-বন্ধন ছাড়িয়ে হঠাৎ বাতায়ন খুলে ভেজা গলায় শুধায়, কে এমন করে কেঁদে যায়? এমন ঝড়-বাদলের নিশীথে স্বামী স্ত্রীকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে ভীত জড়িত কণ্ঠে বলে, "আহা, যেতে দাও না—"

ভুখারিণীর পেছনে দস্যি ছেলের দলটা বেশ দল-পুরু হয়ে উঠল। তারা সেই ঝঞ্ঝারাতের উদাসিনীকে ঘিরে উদ্দাম চঞ্চল

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি চাও ভুখারিণী, অন্ন?" উদাসিনী ছল ছল চোখে আর এক দোরে কর হেনে কেঁদে ওঠে, "মেয় ভুখা হুঁ!"

"অন্ন চাও না? তবে কি চাও,—বস্ত্র?" এবার কণ্ঠস্বরে আরো কান্না আরও তিক্ততা ফুটে ওঠে—"মেয় ভুখা হুঁ!"

উদাসিনী রাজপুরীর প্রান্তে এসে পড়ল।

অধীর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে দস্যি ছেলের দল চীৎকার করে উঠল, "বল্ বেটী কি চাস্; নইলে তোর একদিন কি আমাদের একদিন,—কি চাস্ তুই? আশ্রয়?"

ভুখারিণী কিন্তু কথাও কয় না, ফিরেও তাকায় না। একটা একটানা বেদনা ক্রন্দন-ধ্বনি তার আর্তকণ্ঠে বারে বারে গুম্‌রে উঠে—"মেয় ভুখা হুঁ।"

দস্যি ছেলেগুলো এবার সত্যি সত্যিই ক্ষেপে উঠল। তাদের কৃপাণ একবার কোষমুক্ত হয়ে আবার কোষবদ্ধ হল, এ যে নারী, মা।

কিন্তু রক্ত তাদের তখন অগ্নি-গিরিগর্ভের বহ্নি-সিন্ধুর মত গর্জন ক'রে উঠেছে, তাদের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। আর পারে না, সব বুঝি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় এবার। উদাসিনী এক গভীর অরণ্যের প্রান্তে এসে ছিন্ন কণ্ঠে কপোতিনীর মত আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো, "মেয় ভুখা হুঁ!"

ঝঞ্ঝা যেন মুখে চাবুক খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। বনের দোলা, নদীর ঢেউ, বৃষ্টির মাতামাতি সমস্ত তার বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। দিগন্তকোল থেকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রক্ত-আঁখি মেলে বেরিয়ে এলো। বনের শ্বাপদসঙ্কুল উদাসিনীর পায়ের তলায় মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম।

সে কি অকরুণ নিস্তব্ধতা, কানের কাছে কোন্ না-শোনা সুরের অগ্নিঝঙ্কার যেন অবিরাম করাত চলার মত শব্দ করতে লাগল—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্—ম্।

সেই সুর উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে, খাদের দিকে নামতে লাগল।

এইবার যেন, "বাজে রে বাজে ডমরু বাজে হৃদয় মাঝে, ডমরু বাজে।"

এই কি বিশ্ব ঘোরার প্রণব নিনাদ? এক সাথে তিনটি উল্কা আকাশ ফুঁড়ে ধরণীর বুকে এসে পড়ল। সে যেন ক্ষ্যাপা ভোলানাথের ছোঁড়া ত্রিশূল, অথবা তাঁরই ত্রিনয়ন হতে ঝ'রে পড়া তিন ফোঁটা অগ্নি-অশ্রু।

দুষ্টু মেয়ে গঙ্গা কল্‌কল্‌ কল্‌কল্‌ করে হেসে উঠে সব নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলে। দিগ্‌চক্র-রেখায় রেখায় বনানীপুঞ্জ দুলে দুলে উঠল, সে যেন উল্লসিত শিবের জটাচাঞ্চল্য।

পাগলী আবার কেঁদে উঠল, "মেয় ভুখা হুঁ।"

দস্যি ছেলের দল এবার সত্যি সত্যিই অধৈর্য হয়ে উঠল। উদাসিনীর কেশাকর্ষণ ক'রে উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে উঠল, "বল্‌ বেটী, কি চাস্‌?"

হরিৎ-বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাপালিক। ভালে তার গাঢ় রক্তে আঁকা "অলক্ষণের তিলকরেখা"। বুকে তার পচা শবের গলিত দেহ। আকাশে খড়্গ উৎক্ষিপ্ত ক'রে কাপালিক হেঁকে উঠল,—"বেটী রক্ত চায়"।

কে যেন একটা থাবা মেরে সূর্যটাকে নিবিয়ে দিলে!

দস্যি ছেলেরা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে কোথাও কিছু নেই, শুধু অনন্ত প্রসারিত শ্মশান, তার মাঝে পাগলী বেটী ছিন্নমস্তা হয়ে আপনার রুধির আপনি পান করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে, "মেয় ভুখা হুঁ, মেয় ভুখা হুঁ!"

তরুণের দল হুঙ্কার ক'রে উঠল, "বেটী রক্ত চায়, রক্ত চায়!"

মহা উৎসব পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে—তারা যজ্ঞ করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হল মায়ের ছেলেরাই।

আজ শ্মশান নিস্তব্ধ, জগৎ-সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে বিশ্ব যেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল, তেমনি স্তব্ধাহত।

রক্ত-যজ্ঞের পরের দিন কৈলাসে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা দশ হাতে করুণা, স্নেহ আর হাসি বিলোচ্ছে দেখলাম, বললুম বেটী জগদ্ধাত্রীই বটে। কাল তার ছেলেরা বলি হয়ে বেটীর ক্ষুধা মেটালে, আর আজ সে দিব্যি অন্নপূর্ণা সেজে আনন্দ বিলোচ্ছে।

একরাশ ফোটা শিউলি পূবের হাওয়ায় উড়ে এসে আমায় চুম্বন ক'রে গেল। কেমন করুণ শাস্তিতে মন যেন আবার কান্নায় কান্নায় ভরে উঠলো।

ও হরি! দেখি কি, অন্নপূর্ণা বেটীর ঘরের একপাশে তার ছিন্নমস্তা ভৈরবী মূর্তির মুখোশটা পড়ে রয়েছে। ভোলানাথ তো হেসেই অস্থির।

আরো দেখলুম, কালকার রক্ত-যজ্ঞের আহুতি ঐ দস্যি ছেলের সব ক'টাই জলজ্যান্ত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যে দশটা ছেলে নীলকণ্ঠ শিবের কাছে, তাদের সব কণ্ঠ নীল। সে নীল দাগ তাদের টুঁটি টিপে মারার—ফাঁসীর দাগ। আর যে দলটা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার ঘরের পাশে জটলা করছে, তাদের কণ্ঠে লাল দাগ; ঘাতকের হানা খড়্গ রক্ত-প্রেয়সীর শরম-রঞ্জিত চুম্বনের মত তাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে।

পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?

"পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?"

বনানী কুন্তলা ষোড়শী বনের বুক চিয়ে বেরিয়ে এসে পথহারা পথিককে জিজ্ঞাসা করেছিল, "পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?"

সেদিন দিশেহারা পথিকের মুখে উত্তর যোগায়নি। সুন্দরের আঘাতে পথিকের মুখে কথা ফোটেনি।

পথিক সেদিন সত্যই পথ হারিয়েছিল।

হে আমার গহন-বনের তরুণ-পাথিক দল! আজ সেই বনানী কুণ্ডলা ভৈরবী-সুতা আবার বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছি—চোখে তার অসঙ্কোচ দৃষ্টির খড়্গ-ধার, ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত-তিলক, হাতে তার অভয় তরবারি—সে আবার জিজ্ঞাসা করছে—"পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?"

উত্তর দাও, হে আমার তরুণ পথ-যাত্রী দল! ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারী ভায়েরা। বল্, তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথ-হারা পথিকের মত মৌন নির্বাক চোখে ঐ ভৈরবী রূপসীর পানে চেয়ে থাকবি? উত্তর দে মায়ের পূজার বলির নির্ভীক শিশু!

বল্, "মাভৈঃ। আমরা পথ হারাই না! আমাদের পথ কখনও হারায় না", বল্, "আমাদের এ-পথ চির-চেনা পথ। হাটের পথিকের পায়ে-চলার পথ আমাদের জন্য নয়। সিংহ-শার্দূল-শঙ্কিত কণ্টক-কুণ্ঠিত বিপথে আমাদের চলা। ওগো ভৈরবী মেয়ে। এ রক্ত-পথিকের দল, নবকুমারের দল নয়।" ভৈরবী রূপসী আবার জিজ্ঞাসা করে, "পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?"

এবার বল আমার বন্য তরুণ দল, "ওগো, আমরা পথ হারাইয়াছি, বনের পথ হারায় নাই।"

অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা বন-বালার চোখে কুণ্ঠার ছায়া-পাত হোক, পরাজয়ের লাজ-অবগুণ্ঠন পড়ুক!

নিবিড় অরণ্য। তারই বুকে দোলে, দোলে মহীরুহ সব দোলে—বনস্পতি দল দোলে—লতা-পাতা সব দোলে! দোলে তারা সবুজ খুনের তেজের বেগে। তারই মাঝে চলে—চলে আমার বন্য-হিংস্র বীরের দল। তাদের পথ দেখায় কাপালিকের রক্ত-তিলক-পরা ভৈরবী মেয়ে। অদূরে কাপালিকের রক্ত-পূজার মন্দির। মন্দিরে রক্ত-ভুখারিণীর তৃষ্ণা-বিহ্বল জিহ্বা দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে পড়ছে কাঁচা খুনের ধারা। দূরে হাজার কণ্ঠের ভৈরব গান শোনা গেল—

"তিমির হৃদয়-বিদারণ, জলদগ্নি নিদারুণ।
জয় সঙ্কট সংহর। শঙ্কর। শঙ্কর।"

রক্ত-পাগলী বেটীর পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ ক'রে উঠল। রক্ত-মশাল করে ভৈরব-পন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল আরো কাছে—

"বজ্র-ঘোষবাণী, রুদ্র-শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর। শঙ্কর! শঙ্কর!!"

আবার শিব মোচড় খেয়ে উঠল, কিন্তু শব তার বুকে চেপে। মন্দির থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। উল্লসিত বনানী ঝড়ের ফুঁ দিয়ে নাচতে লাগল।

কাপালিকের রক্ত-আঁখি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর দেরী নাই, ঐ আসে রক্ত-পূজার বলি। ছেড়ে দে বেটী, ছেড়ে দে শিবকে, কল্যাণকে উঠে দাঁড়াতে দে।

ইন্দ্রের বজ্রে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হতে লাগলো।

মেঘ-ডম্বরুতে বোধনের বাজনা বাজতে লাগলো।

বিজলী মেয়ের বজ্র কড়া-নাড়ার মত বাইরে দস্যি মেয়ে কড়্ কড়্ ক'রে কড়া নেড়ে হেঁকে উঠল, "দোর খোল, পূজা এসেছে।"

বাইরে ঝড়ের দোলার তালে তালে ভৈরবপন্থীর দল নাচতে লাগলো— "কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।"

ঝন্ ঝন্ শব্দে মন্দির-দ্বার খুলে গেল। কাপালিক বেরিয়ে এল, নয়নে তার দারুণ হিংসা-বহ্নি, স্কন্ধে তার বিজয়-কৃপাণ। মন্দিরের অঙ্গনে নৃত্য চলতে লাগল—

"তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।" ভৈরবী হাঁকলে, "আর দেরী কি?"

বনানী তেমনি দোলে—দোলে—দোলে। একটা কাৎরানি,

একটা ব্যথিতার ক্রন্দনের মত কি যেন দোলে—দোলে বনানীর পাগলামিতে। কখন পূজা শেষ হয়ে গেছে। কখন ঘণ্টা বাজল, কখন বলি দেওয়া হল, তা কেউ জানলে না। শুধু মন্দিরের শুভ্র বেদী রক্তে ভেসে গেছে। শব-পাগলী বেটীর চরণ শিবের বুক থেকে শিথিল হয়ে যেন নামতে চাইছে। বেটীর পায়ে একরাশ কাঁচা হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করছে, যেন সদ্য-ছিন্ন রক্তজবার জীবন্ত কাৎরানি।

একরাশ ছিন্নমুণ্ড ক্ষেপী বেটীর পানে ছল্‌ছল্ চোখে তখনো তাকাচ্ছে। আকাশ থেকে অগ্নিরথ নেমে এলো। বলিদানের তরুণরা তাতে চড়ে যখন ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে যেতে লাগলো, তখন বন্য মেয়ে কাপালিক-কন্যারও দুই গণ্ড বেয়ে টস্‌টস্ ক'রে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে করুণ কণ্ঠে আর একবার জিজ্ঞাসা করল,—"পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?" তারপর শঙ্করী বেটীর রক্তমাখা পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাপালিকের খড়্গ আর একবার নৃত্য ক'রে উঠল। ভৈরবী শুধু বললে, "মা"!

এবার করালী বেটীর অশ্রুহীন চোখেও অশ্রুপুঞ্জ দুলে উঠল। ততক্ষণে অগ্নিরথ যাত্রীদলের উত্তর ভেসে এল, "পথ হারাই নাই দেবী! ঐ খড়্গ-চিহ্নিত রক্ত-পথই শিব জাগাবার পথ।"

আমি সৈনিক

এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক সৈনিক হ'তে পারবে, সেবার ভার নেবে নারী, কিংবা সেই পুরুষ যে পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালবাসা আর পুরুষের ভালবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশী। পুরুষের ভালবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান।

দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে সে পুরুষ নয়, হয়ত মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায়, মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়,

সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হ'লে আঘাতও করবে, প্রতিঘাত বুক পেতে নেবে। বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা আঘাত করার পশুত্ব বা পৈশাচিকতাকে যে অনুভূতি নিষ্ঠুরতা ব'লে দোষ দেয় বা সহ্য করতে পারে না, সেই অনুভূতিই হচ্ছে নারীর অনুভূতি, মানুষের ঐটুকুই হচ্ছে দেবত্ব। যারা পুরুষ হবে, যারা দেশ-সৈনিক হবে, তাদের বাইরে ঐ পশুত্বের বা অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য ক'রে নিতে হবে। যে ছেলের মনে সেবা করবার, বুকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসার ইচ্ছাটা জন্মগত প্রবল, তার সৈনিক না হওয়াই উচিত। দেশের দুঃস্থ আর্ত পীড়িতদের সেবার ভার এই সব ছেলেরা খুব ভালো ক'রেই করতে পারবে। যেমন উত্তর বঙ্গের বন্যা পীড়িতদের সেবা সাহায্য। বাঙ্‌লার ত্যাগী ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র আজ মায়ের মমতা নিয়ে দু'হাতে অন্নবস্ত্র বিলোচ্ছেন, এ রূপ জগদ্ধাত্রীর, এ রূপ অন্নপূর্ণার ; এ রূপ, এ মূর্তি তো রুদ্রের নয়, প্রলয়ের দেবতার চোখে এমন মায়ের করুণা ক্ষরে না। এই যে হাজার হাজার ছেলে এই আর্তদের সেবার জন্য দু'বাহু বাড়িয়ে ছুটেছে, এ ছোটা যে মায়ের ছোটা, এ করুণা এ সেবা-প্রবণতা নারীর, দেবতার। আমরা এঁদের পূজা করি, কিন্তু এতে তো দেশের বাইরের মুক্তি স্বাধীনতা আনবে না।

রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাঙ্‌লার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্য বাঙ্‌লার চোখের জল চির-নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই ? সৈনিক কোথায় ? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র ? সে-পুরুষ এসেছিলেন বিবেকানন্দ, সে-সেনাপতির পৌরুষ হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন খেলার সোনার বাঙলা ! কোথায় কোন্ অগ্নি-গিরির তলে তোর বুকের অগ্নি-সিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে পড়ল ? কোন্ অলস-করা করুণার দেবতার বাঁশীর সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নি তরঙ্গমালা স্তব্ধ নিথর হয়ে

পড়ল? কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক। ওগো করুণার দেবতা, প্রেমের বিধাতা, বাঁশীর রাজা। তোমরা মুক্ত বিশ্বের, তোমরা এ ঘুমন্ত দাস —অলস ভারতের নও। এই অলস ভারতের নও। এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল ক'রে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় কান্নায় এদের অলস আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে। এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আন, হিংসা আন, যুদ্ধ আন, এদের এবার জাগাও, কান্না-কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না। আমরা যে আশা ক'রে আছি, কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে, যার ইঙ্গিতে আমাদের মত শত কোটি সৈনিক বহ্নি-মুখ পতঙ্গের মত তার ছত্রতলে গিয়ে "হাজির হাজির" ব'লে হাজির হবে। হে আমার আজানা প্রলয়ঙ্কর মহা সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য বাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে তোমার হুকুম। সাধ্য কি আমি তার অমান্য করি? হে আমার অনাগত অব্যক্ত মহাশক্তি! বাজাও, বাজাও, এমনি ক'রে আমার কণ্ঠে তোমার প্রলয় শিঙ্গা বাজাও! তোমার রণ-ভেরী আমারই ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে উঠুক। ঘরের পরের সকল মার, সকল আঘাত যেন নির্বিকারচিত্তে, হাসিমুখে সহ্য ক'রে আমি তোমারই দেওয়া তূর্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি। হে আমার অপ্রকাশ মহাবিদ্রোহী, তুমিই আমায় বল দিয়ো। যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকা-তলে তোমার দেওয়া তরবারি ধরে, রক্ত-সৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি। সেদিন কলিজার শোণিত-মাখা তরবারি তোমার পদতলে অর্ঘ্য দিয়ে যেন তোমার রক্ত-আঁখির প্রসাদ চাওয়ায় বঞ্চিত না হই। যখন দুশমনের বর্শা-ফলক আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে আমায় সৈনিকের গৌরব-

দীপ্ত মরণের অধিকারী করবে, যখন আমার রক্তহীন দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন তুমি বলো প্রভু, "বৎস! তুমি আমার কর্তব্য করেছ।" মনে করি, হয়ত এ তূর্য-বাদনের শক্তি আমার নাই, কিন্তু ছাড়তে তো পারি না, তোমার অব্যক্ত-শক্তি আমায় ছাড়তেও দেয় না, পিছুতেও দেয় না। সে ক্রমেই অগ্রে আরো অগ্রে, ঠেলে নিয়ে যায়। আমার অসম্পূর্ণতা আমার অপ্রকাশ যা তোমার চোখে ক্ষমার, তা যে অন্যের চক্ষে অপরাধের প্রভু। আমার বিদ্রোহের মাঝে যেটুকু অহঙ্কার, শুধু সেইটুকু আমার হোক, তুমি শুধু বল— আমার কণ্ঠে এসে বল—"এ বিদ্রোহ আমার।"

ঐ অহঙ্কারের দুর্নামটুকু যাতে আমি মাথা পেতে নিতে পারি, সেই শক্তি আমায় দাও। আমার মাঝে বিদ্রোহী বেশে যখন এলে, হে আমার অনাগত মহাবিদ্রোহী বিপুল শক্তি, তখন তো বুঝিনি যে আমায় শুধু বাইরের আঘাত, ঘরের মারটুকুর অধিকারী ক'রে নিলে, তখন তো বুঝিনি যে, এই বিদ্রোহের প্রসাদ-এর কল্যাণ-ক্ষীরটুকু তোমার। আজ শুধু ডাকছি আর ডাকছি, আমায় এবার তোমার যুদ্ধ-পতাকা-তলে ডেকে নাও, মরণের মাঝে ডেকে নাও। আমায় দেওয়া তোমার তূর্য-কেতন অন্য সৈনিককে দাও।

সেবার মাঝে আমায় সাড়া দেবার অধিকারী করলে না। বললে,—"আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণতূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই! আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের; আমি সেবক নই, আমি সৈনিক! আমি পূজার নই, আমি ঘৃণার। আমি অবহেলার, আমি অপমানের- আমি দেবতা নই, আমি হিংস্র, বন্য পশু। আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, আমি আঘাত করি। আমি মঙ্গলের নয়, আমি মৃত্যুর। আমি হাসির নই, আমি অভিশাপের।" হে আমার মাঝের তিক্ত শক্তি, রুদ্র জ্বালা, বিষ-দাহন! হে আমার যুগে যুগে নির্মম নিষ্ঠুর সৈনিক-আত্মা, তোমায় আমি যেন প্রশংসার

লোভে খাটো না করি। তোমাকে দেবতা ব'লে প্রকাশ করবার ভণ্ডামি যেন কোনদিন আমার মাঝে না আসে। আমি নিজে যতটুকু, ঠিক ততটুকুই যেন প্রকাশ করি। যুগে যুগে পশু-আমার সৈনিক আমার জয় হউক!!!

[কবি নজরুল ইসলাম তাঁর সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকায় যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলির থেকে কয়েকটি সংগ্রহ ক'রে 'দুর্দিনের যাত্রী' নামে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। ওপরে সেই 'দুর্দিনের যাত্রী'-র রচনাগুলি প্রকাশ করা হলো।]

রাজবন্দীর জবানবন্দী

[নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হ'তেই কবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বার হয়, এবং যথারীতি তাঁকে গ্রেফতার ক'রে জেলে পাঠানো হয়। আদালতে বিচারের দিন ম্যাজিস্ট্রেট ও অসংখ্য জনতার সম্মুখে কবি যে লিখিত জবানবন্দী পাঠ করেন সেই অমূল্য প্রবন্ধটি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামায় ১ম বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩২৯(ইংরাজী ২২শে আগস্ট, ১৯৩১) তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেটি প্রকাশিত হলো।]

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একাধারে—রাজার মুকুট ; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা।

একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড ; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়-দণ্ড। রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী।

আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহা-বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন—ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরী করে নাই। সে আইন সার্বজনীন সত্যের, সে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পরমাণু পরিমাণ খণ্ড সৃষ্টি ; আমার পক্ষে—আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা। রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে—রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হ'তে পারে, কিন্তু ন্যায়-বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হ'য়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙ্গবে কে? এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—চির-কাল ধ'রে আছে, এবং চিরকাল ধ'রে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বাণীকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও

তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি-অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে কাল হয়ত থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই, সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়! কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুব্‌বেই ডুব্‌বে! যাক্, আমি বল্‌ছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোন নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্র যিনি বাজান, সে বীণায় যিনি রুদ্র বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজ-বিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে,—কিন্তু কোন কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি—তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনি ক'রে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী ক'রে তাতে সেই সুর ফুটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশী-সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীরও নয়, সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁকে বন্দী করবার মত পুলিশ বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তাঁর প্রাণকে অনুবাদ করেনি, তাঁর সত্যকে

অনুবাদ করতে পারেনি। আর অনুবাদে রাজানুগত্য ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেন না, আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি—আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্য-সুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্যবিচারক হ'তে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন ক'রে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হ'ল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল, সেদিন ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে গেছিল। নৈলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি, তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজ্‌লাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়ত সে শাস্তি দেবে। কেন না সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজ-ভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি এই যে বিচারাসন এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে?—রাজা, না—ভগবান?—অর্থ, না আত্মপ্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত

হয়েছি! বিদ্রোহী কবির বিচার—বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে: তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না; না আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসিবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হলো রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসনে হতে পারে না। এই যে জোর ক'রে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল ব'লে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এ অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল ব'লেই কি আমি আজ রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চীৎকার! আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না! হঠাৎ কখন্ আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আর এক জনের কণ্ঠে গর্জন ক'রে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হতো এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলণ্ড-অধিবাসিবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তা হ'লে সে সময় এই বিচারক আসামীর

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি ক'রেই বলছি।

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,—কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই—সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—তার জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লাভ লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্ম-প্রসাদকে খাটো করি নাই, কেন না আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয় আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-বিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তা হ'লে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন ব'লেই ত লোকে এ মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধ'রে ধ্বংস নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্বসূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত

অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাঙ্‌লার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক ক'রে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন, * * প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে ক'রে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। কারাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্তললাটে, তাঁর মরণবাঁচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আবার শ্রান্ত আমায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ক'রে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় ক'রে নতুন প্রেরণা-উদ্‌বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে—অমৃতের পুত্র আমি, হাসি গানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ ক'রে তুলবো। চিরশিশু-প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই ; কেন না ভগবান আমার সাথে আছেন! আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশপীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ! ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব।

আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি অমৃতস্য পুত্রঃ। আমি জানি—

"ঐ অত্যাচারীর সত্য-পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয় ;
সেই সত্য আমার ভাগ্যবিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।"

প্রেসিডেন্সী জেল, কলিকাতা
৭ই জানুয়ারী, ১৯২৩
রবিবার—দুপুর।

যোগসাধন

[লালগোলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবরদাচরণ মজুমদার ছিলেন গৃহীযোগী। যোগসাধনার কয়েকটি সহজ দিক নিয়ে তিনি 'পথহারার পথ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মাত্র ৩৬ পৃষ্ঠায় এই পুস্তিকাটি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। এই সময় কবি নজরুল শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের নির্দেশমত যোগসাধনায় সক্রিয়ভাবে তৎপর ছিলেন এবং তাঁর 'পথহারার পথ' গ্রন্থের একটি আবেগপূর্ণ ভূমিকাও লেখেন। নানান্ ব্যাপারে কবি-লিখিত ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান, তাই এখানে সেটি প্রকাশ করা হলো।]

বহু বৎসর আগেকার কথা।—বাংলার সাহিত্য-আকাশে আমার উদয় তখন ধূমকেতুর মত ভীতি ও কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছে, গত মহাসমরের রক্তস্নাত রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য আমার রক্ত-ধারায় ছন্দহিল্লোল তুলিয়াছে। আমি তখন আবিষ্টের মত লিখিতেছি, বলিতেছি ; তাহার কোন অর্থ হয় কি না জানিতাম না, কিন্তু মনে হইতেছে তাহার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল যাঁহার ইচ্ছায়, সেদিন তিনি আমায় এমনি গ্রাস করিয়াছিলেন যে

তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নাই। এক সাথে যশের সিংহাসন, গালির গালিচা, ফুলের মালা, কাঁটার জ্বালা—আনন্দ আঘাত পাইতে লাগিলাম। কিন্তু যিনি চালাইতেছিলেন, সেই অদৃশ্য সারথি আমায় চলিতে দিলেন না। লেখার মাঝে বলার মাঝে সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়িত সেই অদৃশ্য সারথির কথা। নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম। মনে হইত তাঁহাকে আজও দেখি নাই, কিন্তু দেখিলে চিনিতে পারিব। এই কথা বহুবার লিখিয়াছি ও বহু সভায় বলিয়াছি।

সহসা একদিন তাঁহাকে দেখিলাম। নিমতিতা গ্রামে এক বিবাহ সভায় সকলে বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখিতেছে আমার প্রলয়-সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহ-সভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তাহার চিরজীবনের সাথীকে বরণ করিল। অন্তঃপুরে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ-ধ্বনি হুলু-ধ্বনি হইতেছে, স্রক-চন্দনের শুচি সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে, নহবতে সানাই বাজিতেছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দ-বাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম। তিনি এই গ্রন্থ-গীতার উদ্গাতা—শ্রীশ্রীবরদাচরণ মজুমদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পথপ্রদর্শক। সাধন-পথের প্রতি পথিক আজ তাঁহাকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁহাকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেইদিন হইতে আমার বহির্মুখী চিত্ত অন্তরে যেন অভাব বোধ করিতে লাগিল। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রূকুটি-ভঙ্গে ভয় দেখাইতেছে; আমি ধূমকেতুরূপে সেই রুদ্র-ভৈরবদের মশাল জ্বালাইয়া চলিয়াছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজিতেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মৃত্যুর সাগরে হারাইয়া গেল! মৃত্যু এই প্রথম আমায়

ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ধর্মরাজ আমার হাত ধরিয়া তাঁহারই কাছে লইয়া গেলেন, যাঁহাকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহ-সভায় দেখিয়াছিলাম, ধ্যানে বসিয়া আবিষ্টের মত তাঁহাকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষবার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার চিরকালের ধ্যেয় তাঁহার জ্যোতিরূপ দেখিলাম। তিনি আমার হাতে দিলেন যে অনির্বাণ দীপ-শিখা, সেই দীপ-শিখা হাতে লইয়া আজ বার বৎসর ধরিয়া পথ চলিতেছি—আর অগ্রে চলিতেছেন তিনি পার্থসারথি-রূপে।

আজ আমার বলিতে দ্বিধা নেই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি আমাকে চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম-ক্ষুধা আজও মিটে নাই কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আমি আমার আনন্দ-রস-ঘন স্বরূপকে দেখিয়াছি। কি দেখিয়াছি, কি পাইয়াছি আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই নাই। হয়তো আজ তাহা গুছাইয়া বলিতেও পারিব না, তবুও কেবল মনে হইতেছে—আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।

যে অমৃত-পারাবারের এক কণামাত্র পাইয়া আমি আজ প্রমত্ত হইয়াছি, সেই অমৃত আজ পাত্র পুরিয়া আমার অমৃত-অধিপ সকলকে পরিবেশন করিতেছেন, অমৃত-পিয়াসী যাঁহারা, তাঁহারা আমারই মত তৃপ্ত হইবেন, তৃষ্ণা তাঁহাদের মিটিবে, তাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তাঁহার যে দীপ্ত-শিখা আমায় পথ দেখাইয়া অমৃত-সাগরের তীরে জ্যোতির্লোকের দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, সেই দীপ-শিখার

প্রাণ এই গ্রন্থ। বহু পথহারা সাধক এই সাধনার দীপ-শিখার অনুবর্তী হইয়া পথ পাইয়াছেন—আজ তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া দুঃখ-শোকের অতীত অবস্থায় স্থিত। সংসারকে "মজার কুটীর" জানিয়া তাঁহারা আজ আনন্দস্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন।

সারাজীবন ধরিয়া বহু সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-ফকির, দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল, আলোক পাইল, তিনি আমাদের মত গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিবস্বরূপ হইয়াছেন। এই গৃহের বাতায়ন দিয়াই আসিয়াছে তাঁহার মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি। তাঁহার সেই সাধনার ইঙ্গিত এই "পথহারার পথে" রহিয়াছে।

আমার যোগসাধনার গুরু যিনি তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। সে সময় আজও আসে নাই। আমার যাহা কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে—কাব্যে, সঙ্গীতে, অধ্যাত্ম জীবনে, তাহার মূল যিনি, আমি যাঁহার শক্তি প্রকাশের আধার মাত্র, তাঁহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম। লোকে শ্রীরামচন্দ্রকেই দেখে, তাঁহার পশ্চাতে যে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যাঁহার সাধনার ফল শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার কথা কয়জন ভাবে? এই দুর্দিনে এই বাংলাদেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ-যোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাঁহার শক্তিতে আজ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালী উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জনগণ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সূর্যোদয়ের আগে যেমন অকারণ বিহগ-কাকলী ধ্বনিত হইয়া উঠে, আমারও এই কয়েকটি অসম্বদ্ধ কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দ আকুতির ক্ষীণ আভাস মাত্র। আদেশ পাইলে এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিব ইচ্ছা রহিল।